KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সানিবাগান এভেনিউ, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীহার গুহঠাকুর
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৯/৭ ৪৯/৮ ৪৯/৯ ৪৯/১১ ৪৯/১২	Year of Publication : Nov 1986 Dec 1986 Jan 1987 March 1987 April 1987
	Condition : Brittle : Good
Editor : আবদুল গফুর	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

নভেম্বর
১৯৮৬

নানা শাখায় প্রসারিত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার নিত্যনব আবিষ্কারগুলিকে অঙ্গীকার এবং আত্মস্থ করেই যথার্থ মানবিক সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব। এই বিষয়ে অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান, আধুনিকীকরণ ও কার্ল মার্কস'।

যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক, প্রমুখ ছান্দসিক, ছাত্রবৎসল অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের জীবনসাধনা নিয়ে লিখেছেন তাঁরই পুত্রোপম ছাত্র ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য।

বিভাগোত্তর চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে মাতৃভাষা এবং বাঙলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণাকর্মের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ড. ওয়াকিল আহমদ।

'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' বিভাগে মূলের সঙ্গে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র কবিকৃত অনুবাদের তুলনা করে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন পিনাকী ভাদুড়ী।

'বিশ্বসাহিত্য' বিভাগে ডোমিনিক লেপিয়ারের কলকাতা নিয়ে সাম্প্রতিক উপন্যাস 'সিটি অব জয়'-এর পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন মঞ্জুষ দাশগুপ্ত।

'রবীন্দ্রভবনে'র প্রথম অবেক্ষক শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপন।

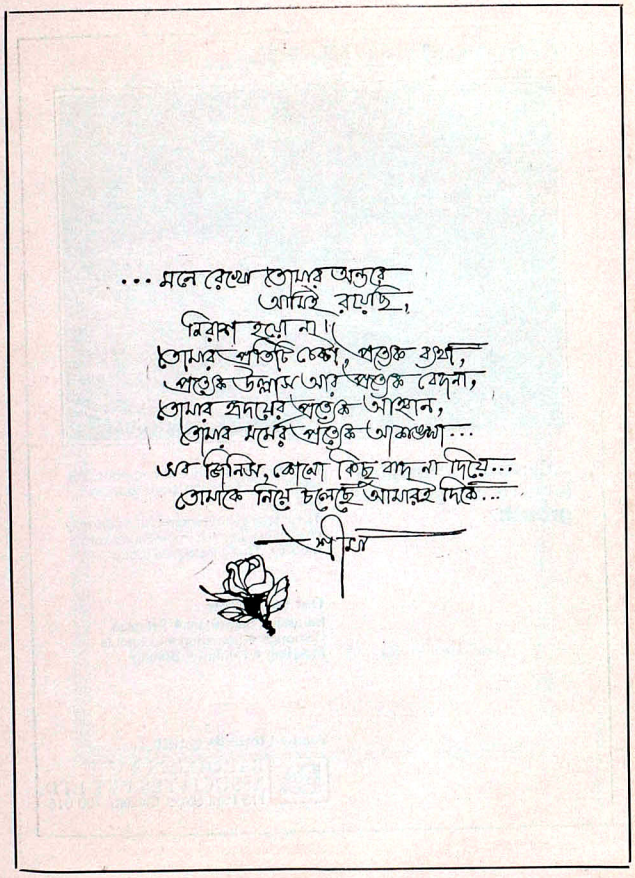

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৮৬
কার্তিক ১৩৯৩

বিজ্ঞান, আধুনিকীকরণ ও কার্ল মার্কস সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫০৯
বাংলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণা ওয়াকিল আহমদ ৫৩৫
হিংসার বদলে—২ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫৪৮

সংগতি বিরাম মুখোপাধ্যায় ৫২০
কালোজল কালোবেলা খসরু পারভেজ ৫২১
কাউনটার ট্রানসফারেনস কামাল হোসেন ৫২২
ডেকে দিয়ে যায় তমিজউদ্দীন লোদী ৫২৩

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৫২৪
আমাদের কলকাতা অভিজিৎ চৌধুরী ৫৪৪

গ্রন্থসমালোচনা ৫৫৫
শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার ৫৬০
'সে কি ভোলা যায়' বর্ণালী দাস

বিশ্বসাহিত্য ৫৬৪
বস্তির দলিল : সাহিত্য ? প্রতিবেদন ? মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ভাস্কর্য ৫৬৭
হেনরি মুর প্রণবরঞ্জন রায়

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৫৬৯
গীতাঞ্জলি ও তার অনুবাদ পিনাকী ভাদুড়ী

স্মরণে ৫৭৫
দেবীপদ ভট্টাচার্য, শহীদুল ইসলাম

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

এগিয়ে চলার নয় বছর
শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন পথ

১৯ ৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। ৪২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ছাত্রসংখ্যা থেকে গত নয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৫২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার। এই সময়ে তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র বেড়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও ৪৪ হাজার। ষষ্ঠশ্রেণী প কল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বণ্টন করা হচ্ছে। বিনামূল্যে জলখাবার পাচ্ছে ৩২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। গ্রামীণ এলাকায় সকল তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রী ও শতকরা ২৫ ভাগ অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে ২৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অথবা জুনিয়র বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সুযোগ ছিল ৭৪৩টি বিদ্যালয়ে এবং ১৬৪টি কলেজে। বর্তমানে ১১১৯টি বিদ্যালয় ও ২৬৮টি কলেজে এই সুযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৮,২৬০টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের জন্য খোলা হয়েছে ৫০টির ওপর নতুন কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন ৬৩৯ কোটি টাকা, যেখানে সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৬৩৬ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে—১০৮ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের—৮'৭৫ টাকা। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাবদ বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১'২ শতাংশ।

এছাড়াও শিক্ষালাভের সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য গত নয় বছরে ১৭৬১টি নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৭৬২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫২৩টি। উৎসাহী ক্রেতার কাছে ভাল বই পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যে রাজ্য পর্যায়ে ৩টি এবং জেলা পর্যায়ে ১৬টি গ্রন্থমেলা হয়েছে, সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগেও একটি বইমেলা হয়েছে। গবেষক, উৎসাহী পাঠক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে সরকার একটি আধুনিকতম গ্রন্থপঞ্জীর মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজে হাত দিয়েছেন।

সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে ও লোকসংস্কৃতির ধারাকে চলিষ্ণু রাখার স্বার্থে অনেকগুলি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যদান ও সাহিত্য প্রকাশনায় অনুদান প্রদান এগুলির অন্যতম। শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্র, আলাউদ্দীন ও দীনবন্ধু পুরস্কার। নেপালী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে ভানুভক্ত পুরস্কার। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে নেপালী, বাংলা ও উর্দু আকাদেমী এবং সঙ্গীত আকাদেমী। আদিবাসী মানুষদের কৃষ্টিকে রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র—সিউড়ি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে। চলচ্চিত্রকে উন্নতমানের করার জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং প্রেক্ষাগৃহ ও কৃষ্টিকেন্দ্র "নন্দন"। উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে গিরিশ মঞ্চ।

সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষার ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য আজ আমাদের একতাবদ্ধ হবার দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৫৪১/৮৬

বিজ্ঞান, আধুনিকীকরণ ও কার্ল মার্কস

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রকৃতির শক্তিরহস্যকে আবিষ্কার করে, যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী করে আপনার ব্যবহারে যন্ত্রকে কাজে লাগাল মানুষ। এর থেকেই তার সভ্যতার একটু নতুন পর্যায়ের—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা-নির্ভর আধুনিক পর্যায়ের আরম্ভ। বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্প-সভ্যতা যখন এল, তখন এল শুধু যন্ত্রশক্তি নিয়ে নয়, এল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ভাবনা-চিন্তা, নতুন উৎপাদনপদ্ধতি, নতুন মূল্যবোধ নিয়ে। চিরায়ত, ঐতিহ্যানুসারী নিশ্চেষ্ট, প্রথাবদ্ধ সমাজে আবির্ভাব ঘটল এক সচেষ্ট শক্তির,—যে শক্তি শুধু যন্ত্রশক্তি নয়, মানসী শক্তিও। আধুনিক ইউরোপের বিকাশধারায় এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপের জীবনধারার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনের পিছনে ছিল নানা কারণ—অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ; সবার উপরে সমাজের সচেতন অন্তঃকরণ। গ্রামপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রবদ্ধ, আচারবদ্ধ, মন্ত্রবদ্ধ, বিরলাঙ্গিক কৃষিপ্রধান সমাজের রূপান্তর কিভাবে সম্ভব হল, যন্ত্রসহায়ে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, পুঞ্জীভূত ধনকে ক্রমবিস্তৃত করে, বিভিন্ন দেশ কী করে "উন্নত" আর "আধুনিক" হয়ে উঠল, ভাবুকেরা (মার্কস-ও) অনেকদিন থেকেই তার রহস্য-সন্ধান করেছেন। তাঁরা দেখেছেন—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠে নানা দেশ, নানা পদ্ধতিতে, বড়ো জ্ঞান-কর্ম-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, নতুন-নতুন শিক্ষায় পৃথিবীর সঙ্গে নতুন সংস্পর্শে এসেছিল। কৃষিকর্ম, শিল্পকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-জ্ঞান সমস্তকে নিখিলবিশ্বের সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলেছিল। প্রথাবদ্ধ, আচারবদ্ধ, প্রাক-শিল্পায়িত, গ্রামসমাজ হতে উত্তীর্ণ হয়েছিল যন্ত্র-নির্ভর, শিল্পসভ্যতার পর্যায়ে ; অর্থাৎ "আধুনিক" হয়ে উঠেছিল।

২

তর্কবাগীশ কূটতর্ক তুলে প্রশ্ন করবেন—"আধুনিক"-এর লক্ষণনির্দেশ করো। 'তৎকালীন', 'সমকালীন', 'সাম্প্রতিক', 'একালীয়', 'আধুনিক',—এইসব পদের পরিচ্ছন্ন অর্থবোধ না হলে, নৈয়ায়িক আলোচনা অবান্তর। নৈয়ায়িক লক্ষণ-নির্দেশে প্রবৃত্ত না হয়ে মেনে নেওয়া ভালো, আধুনিক যুগের সিংহদ্বার উন্মোচিত হয়েছিল ইউরোপের রেনেসাঁস আর রিফরমেশনের চাবিকাঠিতে, বিশেষত ফরাসি বিপ্লব আর শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতে। সেই অভিঘাতই অর্থনীতিকে, সমাজকে, শিক্ষাকে, ভাষাকে, ধর্মকে, সাহিত্যকে অতীতের জড়বন্ধন হতে

মুক্ত করে এদের অন্তরে নতুন ভাব, নতুন কল্পনা, নতুন কর্ম আর জ্ঞানশক্তিকে জাগিয়ে তুলে ইউরোপকে "আধুনিক" করে তুলেছিল। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ব্যবহার করে, মন আর বুদ্ধি খাটিয়ে, পৃথিবী থেকে অনেক বেশি সম্বল আদায় করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করেছিল এবং গ্রাম্যতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করে তুলেছিল ইউরোপকে।

পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এমন অঞ্চলে বাস করে যাকে বলা যায় অনুন্নত, অনগ্রসর, অনাধুনিক। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক উন্নত অঞ্চলের অধিবাসী। নানা কারণে অনেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রথম এগিয়ে যায়। স্বভাবতই তারা ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যেসব দেশ পরে উন্নয়নের পথে পা বাড়ায়, তারা স্বাভাবিক কারণেই পিছিয়ে আছে।

সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং ইতিহাসের দার্শনিকেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অনুন্নত সমাজের "উন্নয়ন", "বিকাশ" এবং "আধুনিকীকরণের" সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। অর্থনীতিবিদরা প্রধানত অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে সমস্যাটির বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিকেরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং আধুনিকীকরণের শর্তগুলি বিশ্লেষণকালে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবিধ উপাদানগুলিও বিবেচনার মধ্যে রেখেছেন।

কোন্ লক্ষণ দেখে অনাধুনিক, অনুন্নত সমাজকে উন্নত সমাজ থেকে পৃথক করা সম্ভব? প্রথমত, উন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের মান অনেক নীচু। অনাধুনিক, অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বড়ো অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের এই দারিদ্র্য শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব-প্রসূত নয়। তৃতীয়ত, যে কলাকৌশল এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে, প্রাকৃতিক সম্বলের সদ্ব্যবহার করে, উন্নত অঞ্চলগুলি সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে, অনুন্নত অঞ্চলে সে ধরনের উদ্যোগ আর মানসিকতারও অভাব। ওইসব অঞ্চলে সমাজে এই চেতনা আজও যে সঞ্চারিত হয় নি, প্রকৃতির গুপ্ত-ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে টিকে থেকে প্রগতির পথে যাওয়া সম্ভব; চতুর্থত, উন্নত অঞ্চলে সামাজিক সংগঠনও উন্নততর উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, অনুন্নত অঞ্চল-সমূহে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা, প্রথা, আচার, বিশ্বাস, পরিকাঠামো, মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এসবই উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৩

আধুনিকীকরণ, উন্নয়ন প্রভৃতির প্রসঙ্গ উঠলে স্বতই মার্কসবাদের কথা এসে পড়ে। অনেকের মতে, কার্ল মার্কস শুধুই শ্রেণীসংগ্রামের পুরোধা, বিপ্লবে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, কলহপ্রিয় একজন জারমান ভাবুক। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, উদ্‌বৃত্ত-মূল্য-তত্ত্ব, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রভৃতি অসাবেকি মতামত প্রকাশ করেই যাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি। ভক্তদের মূঢ় প্রচারের ফলে, এবং বিপ্লবোত্তর বিভিন্ন সমাজে মার্কসবাদী আচারের বিকার দেখে, একথা অনেকেরই স্মরণে নাও থাকতে পারে যে, সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির শুদ্ধ আর সবল ভূমির উপর মানুষের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই মার্কস-ই। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম থেকে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর আত্মচ্যুতির (alienation) দার্শনিক তত্ত্ব। তিনি চেয়েছিলেন মানবীয় সত্তাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার বৈষয়িক তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর সুযোগ সৃষ্টি করতে। এই সুগভীর সুর মার্কস-সাহিত্যের আকাশ জুড়ে রণিত হয়েছে।

সেই মার্কসই যখন ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস বিচার করে, মানব-সভ্যতার বিবর্তনে আর্থনীতিক শক্তির সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাও শতাধিক বৎসর পূর্বে, তখন সত্যই বিস্ময় জাগে। মার্কস জানতেন, ইতিহাসে বাস্তবের যে বিশেষ-বিশেষ, অনন্য দিকগুলি আবির্ভূত হয়, সেগুলিকে কয়েকটি সাধারণ প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত করা সম্ভব নয়। এইসব দিক মিলে যে "সমগ্র বাস্তব" গড়ে ওঠে, তাকেও ইতিহাস-অতিক্রমী সাধারণ কয়েকটি ধারণার মধ্যে ধরে রাখা যায় না। সেই প্রয়াসের সীমাবদ্ধতা জেনেও, সমাজ এবং সভ্যতার পর্ব হতে পর্বান্তরে যাত্রাকে মার্কস চিহ্নিত করেছেন কয়েকটি মোটা দাগে—ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনার "পদ্ধতি" হিসাবে। তাঁর মতে—আদিম গোষ্ঠীজীবনের পর সাক্ষাৎ মেলে দাস-সমাজের। য়ুরোপে দাসত্বপ্রথা লোপ পাওয়ার পর মধ্যযুগে দেখা দেয় সামন্তপ্রথা। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেয় মূলধনী ব্যবস্থা। মূলধনী ব্যবস্থার অন্তে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদয় সম্পর্কে মার্কসের গভীর প্রত্যয় ছিল। এ ছাড়া এশীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সমাজকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন "এশিয়াটিক উৎপাদন-পদ্ধতির সমাজ" হিসাবে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, মার্কস একথা বলতে চান নি যে, সব সমাজই একই ধরনে, একই সরলপথ বেয়ে, একই সোপান পেরিয়ে, দাস-সমাজ,—সামন্ত-তন্ত্র,—মূলধনী সমাজ অতিক্রম করে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে, অন্তিমপর্বে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে। ইতিহাস পর্যালোচনায় স্থান, কাল, পাত্র, যুগ, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, মানসিকতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে কোনো ইতিহাস-অতিক্রমী (supra-historical) বিশ্বজাগতিক তত্ত্ব-কথায় উপনীত হন নি মার্কস। ইতিহাস সরলরেখায় বিবর্তিত হয় (unilinear)—এই অর্বাচীন বিশ্বাসের মুগ্ধতা অন্তত তাঁর ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র হতে শিল্পনির্ভর মূলধনী ব্যবস্থার উদয় সম্পর্কিত তাঁর "ছক"কে যাঁরা একটা ধরা-বাঁধা ঐতিহাসিক-দার্শনিক, বিশ্বজাগতিক আন্দোলনের রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন, মার্কস তাঁদের সমালোচনাই করেছেন। (অ্যাঙ্গেলকভকে লেখা চিঠি: ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৪৬)

ইউরোপীয়, ভারতীয় এবং চৈনিক সমাজের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে মার্কসের অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। এইসব সমাজের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন, কেমন করে এইসব বিশিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট অবয়ব গড়ে উঠল, কোন্ দিকে তাদের যাত্রা—এইসব বিষয় নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আলোচনা করেছেন মার্কস। তবে তাঁর প্রধান কাজ ছিল, আধুনিক শিল্পায়িত মূলধনী সমাজের অভ্যুদয় এবং গতিভঙ্গির বিচার করা।

৪

ইউরোপের সামন্তসমাজ ছিল মূলত গ্রামপ্রধান কৃষক-সমাজ। নানাকারণসন্নিপাতে এই সমাজ একদিন ভেঙে গেল, উদয় হল নতুন সমাজের। সেই ইতিহাস-টা কেমন? সেই ইতিহাস অনুধাবন করলে একালীয় আধুনিকীকরণের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইউরোপের ঐতিহ্যানুসারী, গ্রামাশ্রিত সামন্ত-সমাজে "স্বাভাবিক উৎপাদনপ্রথা" প্রচলিত ছিল, যেমন থাকে সব অনাধুনিক সমাজে। খানিকটা বিনিময়ের (exchange) উদ্ভব হলেও এই সমাজে উৎপাদকেরা ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই (use) সাধারণত জিনিসপত্র তৈরি করে থাকে। অবশ্যই, বিনিময়-ব্যবস্থা উৎপন্ন জিনিসপত্রের পণ্যে (commodity) রূপান্তরিত হবার পূর্বলক্ষণ। বিনিময়প্রথা ধীরে-ধীরে বিস্তৃতিলাভ করে এই সমাজের ভিত্তি অনেকখানি শিথিল করে দেয়। তবুও, একথাও স্মরণযোগ্য যে, সামন্তসমাজের ভাঙনের কালেও বিনিময়কারী পরি-

বারের কর্তারা খাঁটি কৃষকই ছিলেন। তাঁরা খেতে কাজ করতেন, এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজন সবাই মিলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রায় সবটাই নিজেদের আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যেই তৈরি করে নিতেন। শুধুমাত্র সামান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদের উদ্‌বৃত্ত উৎপন্নের বিনিময়ে বাইরে থেকে জোগাড় করে নিতেন। খেত থেকে এবং পশুপালন করে তাঁরা যেসব জিনিস পেতেন, সেগুলিকে তাঁরা নিজেরাই ব্যবহারের উপযোগী করে নিতেন। পরিবারের লোকেরাই নিজেদের ধান ভেনে নিতেন, সুতো কাটতেন, কাপড় আর পশম বুনতেন, চামড়া পাকা করতেন। তাঁরা নিজেরাই ঘরবাড়ি তৈরি করতেন, কাজের যন্ত্রপাতি বানাতেন, কামার-কুমোর-ছুতোরের কাজ করতেন। ফলে, তদানীন্তন গ্রামসমাজ গঠিত হত মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল পরিবার-সমষ্টি দিয়ে। অল্প কয়েকটি জিনিস অন্যের কাছ থেকে তাঁদের খরিদ করতে হত; সেগুলি ছিল কারিগরদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু কৃষক সেগুলি নিজেও তৈরি করতে জানতেন। ওইসব জিনিস তিনি তৈরি করতেন না এজন্য যে, কেনা-জিনিস, অনেক সময়, অনেক ভালো বা সস্তা হত। প্রাক-শিল্পায়িত কৃষকসমাজের চেহারা সব দেশেই বোধ হয় এই ধরনেরই ছিল।

সামন্তসমাজের গর্ভেই মূলধনী (বুরজোয়া) সমাজের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সৃষ্টির ইতিহাসে বহু কারণের কার্যকারিতা ছিল। মার্কস বহুকারণবাদ অগ্রাহ্য করেন নি। তবে অর্থনীতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতি ও তজ্জনিত উৎপাদন-সম্পর্কের বিচারে তাঁর আগ্রহ সমধিক।

মার্কস দেখিয়েছেন, সামন্তসমাজেও মূলধন (capital) ছিল। প্রথমে ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য আর তেজারতি কারবারের জন্য মূলধনের ব্যবহার হত। পুরনো "স্বাভাবিক উৎপাদন" ছিল 'ক্ষুদ্রাকার' উৎপাদন। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার—যেমন জমি, হাললাঙল, ছোটো কারখানা আর তার যন্ত্রপাতি—সবই ছিল হালকা, ক্ষুদ্রাকার, এবং সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক উৎপাদনপ্রথার মধ্যে 'বিনিময়' যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে, ততই সওদাগরদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সমাজে। যে সওদাগরদের হাতে অনেক মূলধন ছিল তাঁরা মালিক জমিদারদের নানা ধরনের বিলাসদ্রব্য সরবরাহ করতে লাগল এবং এভাবে প্রচুর লাভবান হল। ভূমিদাসদের (serf) শোষণ করে জমিদাররা যে খাজনা উশুল করত তার একটা অংশও যেত সওদাগরি মূলধনের প্রতিনিধিদের হাতে। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে তেজারতি কারবারও প্রসার লাভ করতে লাগল। জমিদার, রাজা-মহারাজা আর রাজসরকারের ক্রমেই বেশি-বেশি টাকার প্রয়োজন হতে লাগল। কারণ, এদের প্রগল্‌ভ বিলাসিতায়, অপচয়ে এবং নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে বিপুল ব্যয় হতে লাগল। মহাজনদের ব্যাবসা ক্রমে ফুলেফেঁপে উঠল। মহাজনেরা সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের মোটা সুদে টাকা ধার দিয়ে, ভূমিদাসদের শোষণ করে যে সম্পদ আদায় হত, তার একটা বড়ো অংশও আত্মসাৎ করতে লাগল। সওদাগরি মূলধন (merchant capital) প্রথম-প্রথম শুধু ব্যাবসার জন্যই ব্যবহৃত হত। এই ব্যাবসা চলত হস্তশিল্পী আর চাষিদের তৈরি জিনিসপত্র আর দূর দেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় এমন একটা সময় এল যখন এসব উৎস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যাদি যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না। ক্ষুদ্রাকার হস্তশিল্পে যে সামান্য-পরিমাণ পণ্য তৈরি হত, তা শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের (local market) পক্ষেই পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু যখন দূর-দূর দেশে বাজার বিস্তৃত হল তখন উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিল।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন হতে মূলধনী উৎপাদনের জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের ছিল অনির্বাণ জিজ্ঞাসা। সওদাগরি মূলধনের জায়গায় একসময় আবির্ভাব হল কারখানার উৎপাদন (manufacture)। ছোটো-ছোটো করিগরদের দোকানের পরিবর্তে ছোটো-ছোটো কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ হল। ক্রমে, বাষ্প আর বিদ্যুতের যোগে আবির্ভাব হল বড়ো কলকারখানার। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্থান গ্রহণ করল 'বৃহদাকার উৎপাদন।'

মার্কস বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার নানা চাবি যখন থেকে বিজ্ঞানের হাতে এল, তখন থেকেই সেই শক্তিকে আয়ত্ত করে বৈষয়িক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল মানুষের কাছে। মার্কস আরও বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞাননির্ভর শিল্পসভ্যতা বিষয়ের আয়োজন আর আয়তন ক্রমশ বিপুলীকৃত করে তুলবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে নতুন জীবনের পথে জয়যাত্রার "পূর্বশর্ত" তৈরি করবে। কৃষিতে আনবে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর মানুষকে জয়ী হবার সুযোগ করে দেবে। মনে হবে শিল্পসভ্যতা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-একদিকে মার্কস দেখেছিলেন বিপরীত চিত্র। দেখেছিলেন, শিল্পায়িত মূলধনী সমাজে মানবমাহাত্ম্যের অবমূল্যায়ন, শোষণ-ব্যবস্থা বহাল রাখবার বিরাট সাধনা, বিষয়ের আর ধনের অন্বেষণে আত্মঘাতী মূঢ়তা। এই পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়েই আধুনিক বাস্তবতার সৃষ্টি, এ বোধ মার্কসের ছিল।

বৃহদাকার উৎপাদনে ছোটো-ছোটো মালিকেরা আর কারিগরেরা, যারা গ্রামে বাস করে, কিংবা কখনো-সখনো আশেপাশের গ্রামে ঘুরে-ঘুরে কাজ জোগাড় করে, তারা উৎসন্নে যায়। এই ধরনের উৎপাদনে মূলধনীদেরই (capitalists) প্রধান ভূমিকা। মূলধনী 'মূলধন'-এর মালিক। কারখানা সেই তৈরি করে, প্রচুর কাঁচামাল কেনে এবং শ্রমিকদের একযোগে খাটিয়ে মুনাফা (profit) অর্জন করে। মূলধনী উৎপাদন যখন পরিণতি লাভ করে, তখন ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। তাদের স্থিতিশীল গ্রাম-জীবন যায় ভেঙে। এক ক্রমবর্ধমান জনস্রোত গ্রাম্য-জীবন হতে, চাষবাস হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে, শহরতলিতে কারখানায়, শিল্পাঞ্চলের আশেপাশের গ্রামে গিয়ে জড়ো হয়। সেইসব জায়গায় এরাই এক বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করে। এদের আর বিশেষ কিছুই নেই, আছে শুধু "শ্রমশক্তি"। শ্রমশক্তি বিক্রি করেই এরা বাঁচে। মার্কসবাদে এসব কথারই বিস্তার।

৫

মার্কসের মতে, পুরুষার্থ বা শ্রেয়ঃ কী? তাঁর মতে, শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজই শ্রেয়ঃ, তবে প্রবুদ্ধ, আত্মচ্যুতিমুক্ত মানুষই পরমশ্রেয়ঃ। তাঁর বিশ্বাস, মানুষ স্বকীয় চেষ্টায় একদিন এই স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, পৃথিবীর বুকে দেখা দেবে প্রবুদ্ধ, শিল্পী মানুষের সমবায়িক সমাজ। সভ্যতার পর্বে-পর্বে এদিকেই মানুষ অগ্রসর হয়েছে। 'আধুনিক' শিল্পায়িত সমাজ পূর্ববর্তী সামন্তসমাজের অপেক্ষা প্রগতিশীল নানা কারণে, শুধু বিষয়িগত কারণে নয়, বিষয়গত মানদণ্ডেও। মূলধনী শিল্প-সমাজ আদর্শ সমাজ নয়, তবুও সম্প্রসারণ, দক্ষতাবৃদ্ধি, পারস্পরিক লেনদেন এবং সহযোগিতার বিস্তার, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসারে এর দান সামান্য নয়। এ সমাজ গভীর অর্থে 'আধুনিক', কেননা পরবর্তী সমাজে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় বৈজ্ঞানিক-কারিগরি ভিত্তি এ সমাজই সৃষ্টি করে। সমাজের সকল সদস্যের বৈষয়িক তথা সাংস্কৃতিক মূল্যমানের এক সত্যকার প্রাচুর্যকে নিশ্চিত করার উপায় এই সমাজই আবিষ্কার করেছে। সেই উপায় অবলম্বন করেই নৈতিক মূল্যমান এবং আত্মিক জীবনের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়াও সম্ভব। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞানতৃষ্ণা, বইয়ের বহুল-প্রচার, শিল্পকলার ব্যাপক বিকাশ এবং শিক্ষাসংস্কৃতির ভোজে আপামর সাধারণকে আমন্ত্রণ, এসবই শিল্প-

সভ্যতায় সম্ভব হয়েছে। মার্কসের মতে, মানবশক্তির বিকাশই স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য। বৈষয়িক এলাকা শুধু "প্রয়োজনের এলাকা।" প্রয়োজনের এলাকাকে ভিত্তি করে যে "স্বাধীনতার এলাকা"র উদয়, বৈষয়িকদুশ্চিন্তা মুক্ত মানুষের সৃষ্টিশীল জীবনের অবাধ বিকাশ, প্রত্যেকের ক্ষমতা, প্রতিভা এবং নৈতিক গুণাবলী প্রস্ফুটিত করবার যে ক্রমপ্রসারী সম্ভাবনা, সেইসব প্রশ্ন বিচার করেই মার্কস আধুনিক শিল্পসমাজের পক্ষে সাময়িক রায় দিয়েছেন।

মার্কস বিশেষভাবে জানতেন যে, ইউরোপের মূলধনতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার নীতি শোষণনীতি। শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজাই এই সভ্যতায় প্রবল। শুধু তাই নয়। এ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য অতি-লোভ এবং অতি-ভোগ, কর্মিক ও ধনিকে বিরোধ, জাতিতে-জাতিতে বিরোধ। এই সভ্যতায় নানাভাবে মানুষের ঐক্য পীড়িত, এবং সেজন্যই মার্কস বুঝেছিলেন যে, এই সভ্যতার অন্তস্থলে বিনাশের বীজ বড়ো হয়ে উঠছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও যন্ত্রসভ্যতাকে নির্বাসিত করে প্রাচীন সমাজে ফেরবার কথা তিনি ভাবেন নি। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে আপন কর্মশক্তিকে বহুগুণিত করে জীবনের পথে জয়যাত্রায় এগিয়ে গেছে, সেজন্যই মানুষ আধুনিক। শক্তিকে খর্ব করা নয়, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে নির্বাসিত করা নয়, সেই শক্তিকে মিলিত করে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করে, সমাজকে, এবং মানুষের সুখশান্তিকে, বাঁচাবার ভার মানুষেরই। মার্কস তাই স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, নির্ধনেরাই একদিন বললাভ করে নতুন সমাজ গঠন করবে, বর্তমান সমাজের বেড়া-দেওয়া নানা ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশ-পথ নির্মাণ করবে।

৬

শিল্পায়িত মূলধনতান্ত্রিক সমাজ নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তুলনায় উন্নততর এবং আধুনিক কেন? সামন্ত-সমাজ "পূর্ববর্তী", শিল্প-সভ্যতা "পরবর্তী", এই কালিক অর্থেই কি শুধু "আধুনিক"? "সাম্যবাদী ইস্তাহার"-এ মার্কস এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রথমত, শিল্পপতিশ্রেণী বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের কর্মশক্তিকে বহুগুণিত করে যে উৎপাদনশক্তি সৃষ্টি করেছে এই সমাজে তা অতীত-এর সব যুগের সমষ্টিগত উৎপাদনশক্তির অপেক্ষা অনেক বেশি। মানুষ এ যুগে প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে এনেছে, যন্ত্রের বহুল ব্যবহার শিখেছে, শিল্পে আর কৃষিতে রসায়ন প্রয়োগ করেছে। বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলব্যবস্থা, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ, আবিষ্কার করেছে। চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলেছে, নদীর খাত কেটেছে। ফলে ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব ঘটেছে নানা অঞ্চলে। আধুনিক বুরজোয়া উৎপাদনব্যবস্থার দৌলতে এসব "বৈপ্লবিক পরিবর্তন" এসেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বিজ্ঞানের হাতে।

দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণী যেখানেই প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক, স্নিগ্ধ-শোভন সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে। যেসব বৃত্তিকে মানুষ এতদিন সম্মান করে এসেছে, বুরজোয়া ব্যবস্থায় তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতি-বিহ্বলতা কেটে গেছে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী ছিল—যাজকসম্প্রদায়, অভিজাতসম্প্রদায় এবং আপামর সাধারণ। এই তিন শ্রেণীর কাজকর্ম সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা ছিল। তাদের জীবন-যাপনরীতিতেও পার্থক্য ছিল। প্রত্যেকটি শ্রেণীর পদমর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। আইনের চোখে সবাই সমান—এ নীতি তখনও বলবৎ ছিল না। সামন্ততন্ত্রে শুধুমাত্র প্রথম দুই শ্রেণীর মানুষেরাই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন। মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই স্তর-বিন্যস্ত, উচ্চনীচ-ভেদযুক্ত সমাজে সম্পর্কের "গণতন্ত্রী-করণে"র সূত্রপাত হল, কেননা এই ব্যবস্থায় ডাকতার, উকিল, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলেই বেতন বা মজুরি-ভোগী শ্রমজীবীতে পরিণত হল।

তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় "উৎপাদনের উপকরণে"-ও অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হয়। আধুনিকী-করণই কলের প্রাণ। বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনসম্পর্কে এবং সাধারণভাবে সমগ্র সমাজে নিরন্তর রূপান্তর না ঘটিয়ে শিল্পের রথচক্র সচল থাকে না শিল্পপতিশ্রেণীও বাঁচতে পারে না। ফলে এই সমাজ একান্তভাবে জঙ্গম। এই সমাজে দেখা যায় অবিরাম পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থার চিরস্থায়ী চলমানতা, এবং উত্তেজনা; আমাদের দর্শনের পরিভাষায় এ সমাজ 'রাজসিক'। এই চলমান, নিত্যপ্রসবধর্মী সমাজে চিরায়ত, প্রথা-সিদ্ধ বহু সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে, ভেঙেচুরে যায়। বহু মানসী প্রতিমা, বহু সংস্কার, মতামত আর বিশ্বাস বাতিল হয়ে যায়। আগেকার নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থার পরিবর্তে সচল, শ্রেণীব্যবস্থার জন্ম হয় এই সমাজে।

চতুর্থত, শিল্পসভ্যতায় শুধু যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা ও যন্ত্রশিল্প প্রভৃত পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছে, তাই নয়। "বাজারের জন্য পণ্য-উৎপাদন" করে যে সমাজ, সেই সমাজের অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে আগেকার স্থানীয় এবং জাতীয় বিছিন্নতা, স্বপর্যাপ্তির বদলে—সব ক্ষেত্রেই—ব্যাবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে—দেখা দেয় আদানপ্রদান, জাতিসমূহের পরস্পর-নির্ভরতা। শিল্পপতিশ্রেণী বিশ্বের বাজারকে কাজে লাগাতে চায়। এরা গড়ে তোলে এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু দেশজ কাঁচামাল দিয়ে নয়, দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ফলে দেশজ উৎপন্ন দ্রব্যে যা মিটত এমন সব পুরনো চাহিদার বদলে এরা সৃষ্টি করে নিত্যনতুন চাহিদা। এই চাহিদা মেটাতে দেশদেশান্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ প্রয়োজন। অর্থাৎ কূপমণ্ডুকতা, জাতীয় বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির স্থলে বুরজোয়া ব্যবস্থায় পৃথিবী সত্যই "এক দুনিয়া" হয়ে ওঠে। অন্তত নিখিলবিশ্বকে "একনীড়" করে তোলার পূর্বশর্ত তৈরি করে।

পঞ্চমত, সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। বুরজোয়া-ব্যবস্থায় তো গড়ে ওঠে বিরাট-বিরাট নগর। গ্রামের তুলনায় নগরের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। নগরে ব্যাবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনেই জনসংখ্যা মস্ত হয়ে ওঠে। নগরায়ণ সৃষ্টি করেছে অনেক সমস্যা, নগরে-গ্রামে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, যে সামাজিকতা লোকালয়ের প্রাণ, সেই প্রাণকে আবশ্যকের পায়ে বলি দিয়েছে। তবুও, একথাও মানতে হয় যে, গ্রামসমাজ ছিল মোহাচ্ছন্ন, তামসিক সমাজ। নগরসভ্যতা গ্রামের এক বিশাল জনসমষ্টিকে গ্রামজীবনের কূপমণ্ডুকতা আর বদ্ধতা থেকে নতুন জীবনের পথে যাবার প্রেরণা জুগিয়েছে, নতুন তৃষ্ণা নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে।

ষষ্ঠত, বুরজোয়া শিল্পসভ্যতায় জনসংখ্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রে, উৎপাদনের উপকরণ হয়েছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তি জড়ো হয়েছে অল্প লোকের হাতে। এই আমলেই "জাতীয় রাষ্ট্র" গড়ে উঠেছে, খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলি এসেছে একই শাসনযন্ত্রের অধীনে। তা ছাড়া, এই জাতীয় রাষ্ট্রেই এসেছে একই আইন, একই সীমান্ত, একই শুল্কব্যবস্থা।

সপ্তমত, নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে, সব উৎপাদনযন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগ, যান-বাহন, পরিবহণের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত শিল্পসভ্যতা আধুনিক জীবনের আবর্তে সমস্ত—এমনকি অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া জাতিকেও—টেনে এনেছে। বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে আধুনিক মূলধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন বিপ্লব এনেছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনীষার ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির মানস

সম্পদ আজ সকলের—বিশ্বমানবের—সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। জাতিগত সংকীর্ণতা এবং একপেশেমি ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একদা ছিল জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় শিল্পকলা। আধুনিক যুগে জেগে উঠেছে বিশ্বসাহিত্য, বিশ্ববিজ্ঞান, বিশ্বশিল্পকলা।

৭

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে। যারা যোগান বন্ধ করে তারা বরখাস্ত হয়।' নূতন কালের দাবি মেনে যারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কর্মশক্তিতে, চিৎ-প্রকর্ষে, বিশ্বাসে, আচারে "নূতন অর্ঘ্য" নিয়ে হাজির হতে পারে, তারাই আধুনিক, যোগান যারা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, তারাই অনাধুনিক। আরণ্যক মানুষের এক-দিন বনে ফলমূল খেলে চলে যেত। কৃষির কাজে এল হাললাঙল, এল চাষ-আবাদ, জমি-জমা, আইন-কানুন ইত্যাদি। সঙ্গে এল অনেক মার-কাট, সম্পত্তি নিয়ে মামলা, জাল-জালিয়াতি, অনেক মিথ্যাচার। তবুও কৃষি-সভ্যতা তুলনায় আধুনিক। আদিম কাল থেকেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করেছে। যে কালে বিশেষ-ভাবে বিজ্ঞান নিত্যনূতন পদ্ধতিতে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে যন্ত্র আর কল দিয়ে তাকে বন্দী করে কৃষিতে, শিল্পে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে যোগাযোগব্যবস্থায়, বার্তাবিনিময়ে, স্বাস্থ্যরক্ষায়, শিক্ষায় মানুষের কাজে লাগাতে আরম্ভ করল, তখন থেকেই—অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের পর থেকেই—আসলে আধুনিক যুগের আরম্ভ। যন্ত্রযুগেই মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে মস্ত বড়ো পরদা উঠে গেল। শুধু যে বৈষয়িক ক্ষেত্রে তাই নয়; তার মনের যেসব কক্ষ ছিল তমসাবৃত, তার মধ্যে প্রবেশ করল আলো। জ্ঞানের প্রকাশ হতে থাকল বাধাহীন, কর্মশক্তি দিগন্তপ্রসারী, অপদেবতার পূজায় স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়ে সমাজ হয়ে উঠল সংশয়বাদী। সমকালীন আধুনিকতার এসবই লক্ষণ।

আধুনিকীকরণের সঙ্গে তাই মনকে আলোকিত করে তোলার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন যদি গ্রাম্য থেকে যায়, যুগের চাহিদা অনুযায়ী যদি সামাজিক পরিবেশ, মানুষের এষণা, মূল্যবোধ এবং মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটে, তবে শুধু যন্ত্র আর প্রযুক্তি আমদানি হলেই "আধুনিক" সমাজ সৃষ্টি হয় না।

মার্কস বুঝেছিলেন "আধুনিকীকরণ" এক ধরনের বৈপ্লবিক রূপান্তর—উৎপাদনপদ্ধতিতে, উৎপাদন-সম্পর্কে, অর্থনীতিতে, সমাজ-মানসিকতায়, আচারে, বিশ্বাসে, বোধে। বনিয়াদের (base) রূপান্তর তুলনায় সহজসাধ্য। উপরিকাঠামোর (super-structure) আমূল রূপান্তর কষ্টসাধ্য এবং সময়-সাপেক্ষ। অথচ এ দুয়ের মেলবন্ধন না হলে আধু-নিকতা ফ্যাশনের পর্যায়ে থেকে যায়, নিহিতার্থে আধুনিকতার উদয় হয় না। মার্কস বুঝেছিলেন, এক-কালে যা নিয়ে মানুষের কাজ চলেছে চিরদিন তাই দিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মানুষের প্রয়োজন অনেক, ফলে তাকে ক্রমশ আয়োজন বাড়াতে হয়। সেই আয়োজন জোগাবার শক্তি তার আছে, কেননা মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে, যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছে। যে মানুষ একদিন শুধু গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করেছে, সেই আবার তৈরি করেছে মোটরগাড়ি, আজকের দিনে উড়োজাহাজ। যে মানুষ একদা বাষ্পশক্তি বিদ্যুৎ-শক্তি আয়ত্ত করেছিল, আজ সে আয়ত্ত করেছে সৌরশক্তি আর পরমাণুশক্তিকে।

গভীর ইতিহাসচেতনা থাকায় মার্কস আরও বুঝে-ছিলেন, শিল্পসভ্যতার যে পর্বে মানুষ পৌঁছেছে এবং পৌঁছবে, তার থেকে পিছু-হঠা আর সম্ভব নয়। কেউ যদি বলেন, 'শিল্পসভ্যতাকে বর্জন করো, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে, প্রযুক্তিকে বাদ দাও, তাহলেই তো আপদ মেটে। আধুনিক জীবনের চেহারা যে খুব সুন্দর, শ্রীমণ্ডিত, তা তো নয়।' প্রথমত, একথা বলার মানে, মানুষকে বলা, 'তুমি জীবনের জয়যাত্রার পথে আর এগিয়ো না, থামো।' দ্বিতীয়ত, একথা বললেও মানুষ শুনবে না। কেননা আধুনিক মানুষ বোঝে যে, বিজ্ঞান আর যন্ত্রশক্তিকে বাহন করে সে যদি না এগোয়, তবে তার পরাভব অবশ্যম্ভাবী।

৮

তবুও প্রশ্ন থাকে, আধুনিকরণ চাইব কেন? অনাধুনিক, প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে ধনবৈষম্য এবং অসমতা ছিল, ছিল শ্রেণী-বর্গ-বর্ণ-ভেদ। তবুও, সেই সমাজে ছিল লোকালয়বন্ধনের ব্যবস্থা, এক ধরনের সামাজিক বন্ধন। সেই সমাজেও তো মানুষের ধর্ম-নীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলার বিবিধ অনুষ্ঠান ছিল, মানুষে-মানুষে পার্থক্যের প্রাচীর আধুনিক সমাজে যত অভ্রভেদী, ওই সমাজে তো ততটা ছিল না। শুধু তাই বা কেন! মার্কস বলেছেন, মূলধনচালিত শিল্পসমাজ লাভের আর মুনাফার লোভে চলে। ওই মুনাফার লোভ সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, গার্হস্থ্য, সমস্তকেই বিশেষভাবে আচ্ছন্ন আর কলুষিত করে, রজতকৌলীন্যকে পুরুষার্থ করে তোলে। এ সমাজে আছে ধনী-নির্ধনে বৈরিতা, শ্রেণীসংঘাত, মানুষের পণ্যীকরণ। তবে এ সমাজ কাঙ্ক্ষিত হবে কেন?

পাশ্চাত্ত্যের ও অন্য অনেক দেশের ভাবুকেরাও আধুনিক সমাজে মানুষের সমস্যা নিয়ে আজকাল বিশেষ উদ্বিগ্ন। ইংল্যান্ড, জারমানি, ফ্রানস, সুইডেন, আমেরিকা, জাপানের মতো সম্পূর্ণ আধুনিক দেশে পুঞ্জীভূত বস্তুসম্ভার জমা হচ্ছে, প্রতিদিন নিত্যনূতন যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে যে সমাজ, সে সমাজেরও তো নানা সমস্যা। আজও তো সেসব সমাজে সত্যযুগ এল না। আধুনিক সমাজের বহিরঙ্গটাই বা কেমন?

নিত্যনতুন বিস্তৃততর সড়ক নির্মাণ হচ্ছে, আবার ক্রমশই যানবাহন মোটরগাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। বড়ো-বড়ো কারখানা গড়ে উঠছে, সঙ্গে-সঙ্গে নানা ধরনের শক্তির-কয়লা, পেট্রল, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি—ক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্য বিক্রি হচ্ছে নিত্যনতুন মনোহর আধারে, কিন্তু জীবনসম্ভোগের দিক থেকে সেসব পণ্যের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। বিমান বন্দরের আয়তন বাড়ছে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে, উড়ো-জাহাজের গতিবেগও বাড়ছে, কিন্তু জীবনের স্থৈর্য যাচ্ছে হারিয়ে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সবুজ বিপ্লব ঘটানো হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পৃথিবী হয়ে উঠছে জনভারপীড়িত। ফলে, বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আস্তাকুড়-সদৃশ অঞ্চলও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শব্দদূষণ, নোংরা জল, বিক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ মানুষ, পথদুর্ঘটনায় প্রাণহানি, হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী কি নয়?

পশ্চিম জারমানির একজন ভাবুক তাই প্রশ্ন তুলেছেন: 'গত শতবৎসরব্যাপী যে অর্থনৈতিক বিকাশ আমাদের জীবনে এত সুখ-সমৃদ্ধি এনেছে, পরিণামে জীবনকে কি তা অসহনীয় করে তুলছে না?

আধুনিক জীবনের গুণগত উৎকর্ষ বিচারের মান-দণ্ড যদি হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামাজিক প্রত্যয় আর আশা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উৎকর্ষ, পরিবেশসংরক্ষণ আরও স্বাস্থ্যসম্পন্ন গ্রাম আর নগর, সামাজিকতা, সংহতি, তবে কি বলা চলে নির্দ্বিধায় যে, আধুনিক শিল্পায়িত সমাজ গ্রাম-সমাজের তুলনায় শ্রেয়োতর?

মার্কস এসব সমস্যার কথা জানতেন। আরও জানতেন মূলধনশাসিত শিল্পসভ্যতায় মানুষের আত্ম-চ্যুতি (alienation) পূর্ণতা লাভ করে। এ সমাজে মানুষ টাকার দাস, লোভের খাঁচায় বন্দী, এ সমাজ চলে বাজারে পণ্য বিক্রি করে, মুনাফা-বৃদ্ধির অদম্য তাড়নায়। এ সমাজ নানা দিক থেকেই অসুস্থ, অস্বাভাবিক। এ সমাজে মানুষ পণ্য হয়ে ওঠে, বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি পায়, ব্যক্তি হিসাবে নয়। মার্কস-

পরবর্তী যুগে দেখা গেছে, স্থানকালপাত্রভেদে আধুনিকীকরণের পদ্ধতি-প্রকরণে কিছু-কিছু পার্থক্য আছে। সর্বকালে, সব দেশ হয় ইংল্যানডের ছক, না হয় জারমানির ছক, কিংবা জাপানের ছক অনুসরণ করবে, অথবা অগ্রসর হবে রুশ কিংবা মারকিনি পথে, এমন কোনো ইতিহাসবিধি নেই। আজকাল তাই শোনা যায় "মিশ্র অর্থনীতি"র কথা, অ-মূলধনতান্ত্রিক পথের কথা। তবে একথা সত্য যে, আধুনিকীরণের পথ বর্তমান বিশ্বের সর্বজনীন পথ। এ বিশ্বাস মার্কসেরও ছিল। ভবিষ্যতের কোনো দেশই আর সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসমাজে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, চালু করতে পারবে না একযুগের অবাধ উদ্যোগের (free enterprise) সমাজ। ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্যবাদী হবে, না ফ্যাসিবাদী হবে, না হবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী, তা শুধু বিধাতাপুরুষই হয়তো জানেন। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক চেহারা যাই হোক না কেন, সে সমাজে থাকবে কল আর যন্ত্র—থাকবে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিবিদ্যা, কারখানায় উৎপাদন, বৃহদাকার উৎপাদন। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ক্রমশ যাবে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে। ফলে ফেলে-আসা সেই সহজ-সরল জীবনে ফেরা আর সম্ভব হবে না, সমস্যাকণ্টকিত আধুনিক জীবনের মুখোমুখি হতে হবে মানুষকে। আরণ্যক সমাজে বা কৃষিসভ্যতার পর্বে ফেরা যদি সম্ভবও হত, তবে দেখা যেত আধুনিক মানুষ সেখানে একেবারেই খাপছাড়া, আগন্তুক।

৯

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আজ বিশ্বকে একসূত্রে গেঁথেছে কেননা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি নিখিলবিশ্বে এক এবং অবিভাজ্য। শম্বুকের মতো নিজস্ব খোলের মতো প্রবেশ করে, আধুনিক বার্তাসমৃদ্ধ, কৃৎকৌশলনিবিড় পৃথিবী থেকে পালানো যাবে না। সমাজের চরিত্র-নির্বিশেষে যন্ত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বৃহদাকার কারখানা-উৎপাদন, নগরায়ণ প্রভৃতি নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এই আধুনিকীকরণের তরঙ্গ রোধিবে কে?

মার্কস বুঝেছিলেন, শিল্পসভ্যতা আধুনিক জগৎ গড়বার উপাদান জোগাড় করেছে। আধুনিক ইমারতের জন্য ইট, কাঠ, চুন, সিমেন্ট ইত্যাদি জড়ো করেছে। এইসব উপাদান হল, মানুষের শ্রমশক্তি, যন্ত্র এবং মানুষের মস্তিষ্ক। এইসব উপাদানের সদ্ব্যবহার করে আধুনিক জগৎকে করে তুলতে হবে "মানবিক"।

মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে, ভাবী সমাজের আগমনী শোনা যাচ্ছে।

মার্কস দেখেছেন, সব পর্বের সমাজেই, জ্ঞান এবং শক্তির উপায় আর উপকরণগুলির উপরে বিশেষ কোনো "শ্রেণী" নিজের হাতে রাখে। বহুলোকের শ্রমশক্তিকে কিনতে সক্ষম হয়েছে বলেই আধুনিক শিল্পসমাজে ধনবানদের প্রভাব। তাদের হাতেই আছে মূলধন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার (ধনবানের) টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে।" মার্কস এই কথাই প্রায় বলেছেন অনেক আগে।

মার্কস তাই বুঝেছিলেন, পৃথিবী জুড়ে শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত, বিশেষত মূলধনশক্তির সঙ্গে শ্রমিক-শক্তির সংঘাত না মিটলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। শক্ত-অশক্তের ভেদ, মূলধনশক্তি আর শ্রমশক্তির সংঘাত যদি না থামে, লাভের লোভ যদি সমস্ত সমাজকে আচ্ছন্ন আর কলুষিত করে রাখে, তাহলে মহতী বিনষ্টি।

মার্কস বলেছিলেন, আধুনিক সমাজের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, প্রধান নয় মূলধনী মহারাজেরা—নির্ধনেরা, শ্রমশক্তির অধিকারী নির্বিত্তেরাই প্রধান—ইতিহাসগতভাবে। অতিক্ষীত মূলধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে আর মানুষের সুখশান্তি-সমৃদ্ধিকে

বাঁচাবার ভার সংগঠিত নির্ধনদের 'পরে। পুঞ্জীভূত শক্তির অতিভারেই আধুনিক সমাজ পীড়িত। আধুনিক মূলধনচালিত সমাজে যে শক্তি আজ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, সেই শক্তিকে আজ মুক্তি দিতে হবে। সেই মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মার্কস সমাজতন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণে স্থাপিত হবে সামাজিক মালিকানা। উৎপাদন হবে সমাজের বৈষয়িক এবং আত্মিক শ্রীবৃদ্ধির কথা মনে রেখে। মুনাফার জন্য পণ্য-উৎপাদনের স্থান নেবে সমাজের ভোগের জন্য পরিকল্পিত উৎপাদন। রজতকৌলীন্য দিয়ে মানুষের বিচার হবে না, বিচার হবে উৎপাদক হিসাবে, ভোক্তা হিসাবে, সুনাগরিক হিসাবে তার সামাজিক ভূমিকা দেখে। একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ জীবিকার স্থান নেবে জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব।

১০

মার্কস জানতেন, দৈন্য জিনিসটা শুধু বৈষয়িক নয়। এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে মানুষের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, আচার-সংস্কার-প্রথার দোষে, এবং চারিত্রিক দুর্বলতায়। তবে আরও বড়ো কারণ রয়েছে সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটালেই সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধির ত্রুটি, প্রথার দোষ, চরিত্রের দুর্বলতা দূর হবে না। অথচ, মানুষের সমস্ত জীবনটাকে এক করে ধরে তার ভিতরে বাইরে নবরূপায়ণ করতে সক্ষম না হলে নতুন সমাজ, নতুন মানুষ সৃষ্টি হবে না। তবুও একথাও সত্য যে শ্রেণীবিভক্ত, ব্যক্তিমালিকানা-নির্ভর সমাজরূপান্তরের অন্যতম প্রকরণ হল, উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তি-মালিকানার নিরাকরণ করে সামাজিক মালিকানা এবং কর্তৃত্ব স্থাপন।

মার্কস ভবিষ্যৎ সমবায়িক সাম্যবাদী সমাজের পূর্ণ চিত্র এঁকে যান নি। তবে তাঁর অভিমত ছিল, মূলধনচালিত শিল্পায়িত সমাজ গভীর অর্থে 'মানবিক' নয়, যদিও এ সমাজ 'আধুনিক'। ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ আধুনিকতার সম্পদ বর্জন করে রিক্ত-সমাজ হবে না, হবে প্রাচুর্যের সমাজ—জীবনের বৈষয়িক তথা আত্মিক ক্ষেত্রে। কবি-দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই সমাজ-এর কল্পনা করেছিলেন তিনি। এ সমাজে মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রমশক্তি খাজনা কিংবা মুনাফার বাঁধনে বন্দী নয়। এ সমাজে পুরুতপাণ্ডা, সমাজপতি, পার্টি-নায়কের ভ্রূকুটি-কুটিল শাসন নেই। শ্রমশক্তি এখানে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। এ সমাজে প্রবুদ্ধ মানুষ অর্থনীতির, রাজনীতির, রাষ্ট্রের, ধর্মের, আচারের মিথ্যা-চৈতন্য থেকে মুক্তি লাভ করে সমষ্টির সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন মহত্তর জীবনধারা গড়ে তুলবে। এই সমাজই শুধু মানুষের সমস্ত ধনজন, জ্ঞান আর শক্তি নিয়ে মানুষের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে স্বীকার করতে সক্ষম হবে। এই মর্ত্যলোকেই গড়ে তুলবে নতুন, আধুনিক মানবসমাজ। মার্কসের ভাষায় এই আধুনিক নূতন মানবিকতারই অপর নাম—কমিউনিজম্।*

* এ বিষয়ে যাঁরা সবিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে চান, তাঁরা মার্কসের Economic & Philosophic Manuscripts, 1844, The Grundrisse, Marx & Engels on Literature (Ed by Baxandall & Morawaski, Philosophy in the U.S.S.R. (Progress Publishers—1981), এবং The Two Cultures—C.P. Snow (Cambridge University Press—1974)—বইগুলি পড়তে পারেন।

সংগতি

বিরাম মুখোপাধ্যায়

বন্যায় ঝিলের স্রোতে পল-কাটা হীরকের ছায়া
স্বপ্নালু নিসর্গ যেন ঝিলমিল জলপরী-খেলা
কী ছলাৎছল তীর-ঘেঁষা তৃণ-গুল্মে চুম্বনের
ছোঁয়া—পলিরেখ পাষাণশিলায় আদাড়ে-বাদাড়ে

বিপরীত চীর্ণ ঋতু অপ্রসন্ন জঙ্গম আড়াল—
তবুও স্রোতের দৌড়, কাঁপা-কাঁপা ছায়া চেটে খায়
সবুজাভ মেঘের খিদেরা ; পতিত ও বাঁজা মাটি
প্রসবের সুখ চায়,—পেশী নাড়ি ছেঁড়ে তো ছিঁড়ুক—

ভিন্ন ভায়ে এ-যন্ত্রণা আর-এক অঙ্কুরের গান ;
এই বন্যা এই স্রোত উপপ্লবে অন্বিষ্ট অন্বয়
কমলহীরের দ্যুতি গণিতের বাঁধা-ছকে মেলে ?
অলৌকিক এ-নিসর্গ আমাকেও চুম্বক বানাক্ ॥

কালোজল কালোবেলা

খসরু পারভেজ

কলঙ্ক এসে সত্তায় গড়েছে অহং বদ্বীপ
আগুনের উজ্জ্বল শাড়ি পরেছ তুমি নারী
ভুরুতে ভ্রান্ত কাজল করোটিতে কালো টিপ
পাপের প্রাচীরে প্রাংশু তুমি নির্মম শরীরী।
কলঙ্ক এসে আত্মায় বেঁধেছে পীড়ন পাড়া
বন-বৃষ্টির বাঙলাতে ঝাপটে এসেছে ঘাতক ঝড়
প্রেয়সীপ্রতিম তুমি ডাকলে এ কেমন সাড়া
কালোজলে ভাসল ভেলা কাউনির ঘর-কুটো-খড়।
নষ্টের নিকেল জ্বলে খুনসুরকির রক্তরেখা
প্রেমে জমে বুনো ঘাস বদ্ধ বরেন্দ্রভূমি
মুছে গেছে সুখকীর্তন কারুকাজ অঙ্গন-আঁকা

হায়রে রগড় লখিন্দর কুল কালীদহে তুমি!

জীবনে দুর্ভর দুপুর কালোজল কালোবেলা
ধ্বংসের ধূমল শাড়ি তুমি তো পরেছ নারী
কুয়াশা কাঁকর রাত মন মারাঠায় মরণখেলা
আমূল কলিজায় ঢুকে গেলি হায় ছলাত ছুরি।

মনমৃত্তিকায় জাগো জাতিস্মর 'শ্যামা জন্মদে'
তোমাকেই গড়ে দেব মাধবনগর সান্দ্রসুখ
তন্বী তমাল শাল মিহিনীর খোঁপা দেব বেঁধে
বিচ্ছিন্ন বুকেতে এসো নক্ষত্রনিবিড় সুখ।

বাংলাদেশ

কাউনটার ট্রানসফারেনস

কামাল হোসেন

তোমার বৃত্তের মধ্যে দিনরাত বসে থেকে-থেকে
গেঁথেছ বকুলমালা একমুঠো বিশুদ্ধ বসন্তের জন্য—
শৈশবের খেলার মতো এখন মালাগাঁথা বন্ধ থাক
চালের দাম এবার বেড়ে গেছে অনেক
খরার শুকনো বাতাসে নেই কোনো নিস্পন্দ নিবিড়তা

তোমার বৃত্তের মধ্যে দিনরাত বসে থেকে-থেকে
সম্মোহনের মতো তীর ছুঁড়ে যাচ্ছ একের পর এক
কোনোটা ক্রোধ, কোনোটা ঈর্ষা, কোনোটা জমা-থাকা
নির্মম প্রতিহিংসা
কোনোটা নারীর গোপন ভালোবাসার মতো আর্দ্র রঙিন

ধ্বনিহীন ধ্বনিময়তায় তোমার বৃত্তের মধ্যে দিনরাত
বসে থেকে-থেকে বসে থেকে-থেকে
তিনটি সাপ আর একটি ইঁদুরছানাকে ইতস্তত
আহত করে
গেঁথেছ বকুলমালা শৈশবের খেলার মতো—
এই নীল জিরো পাওয়ারের আলোর নিস্পৃহ বিষাদে
তোমার সম্মোহনী চোখ মেলে ধরেছ
আমার চোখের ওপর
আমি রেগে যাচ্ছি, হেরে যাচ্ছি,
সামলাতে পারছি না নিজেকে

ডেকে দিয়ে যায়

তমিজউদ্দীন লোদী

মৃৎপাত্রে রক্ষিত স্বপ্নের উল্লাস
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে বলো কার কাছে যাব?
হাঙর সময় আজ গিলে খাচ্ছে তাবৎ সুন্দর
পুরনো লোহার মতো পৃথিবীও জং খেয়ে গেছে
তুমিও কি রাতারাতি নিজেকে পালটালে?
অথচ ভোরের সফেন সুন্দরে
কে যেন এখনো ভালোবাসা ডেকে দিয়ে যায়।

: বাংলাদেশ

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পনের

In Heaven a spirit doth dwell
"Whose heart-strings are a lute"
None sing so wildly well
As the angel Israfel···

চান্দ্রমাস জেলহজ্জের দশম দিবসে কেয়ামতের (মহা-প্রলয়) নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। সেই দিবস সূর্য উঠিবে না। দুনিয়া অন্ধকার থাকিবে। মানুষসকল ভাবিবে, ইহা কী হইল? তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতঃপর তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিবে, পশ্চিম-দিকে সূর্য উঠিতেছে। তখন তাহারা জানিবে, কেয়ামত নিকটবর্তী। কিন্তু হায়! তখন তওবার (ক্ষমাপ্রার্থনা) দুয়ার আল্লাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা পবিত্র কেতাব খুলিয়া দেখিতে পাইবে, হরফসকল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আর এই সময় আরবদেশের সাফাপর্বত বিদীর্ণ করিয়া দাব্বাতুল আরদ বাহির হইবে। ইহার মুখের চেহারা মানুষের মতন। কিন্তু গর্দান ঘোড়ার মতন। পা উটের মতন। লেজ গোরুর মতন। পশ্চাদ্দেশ হরিণসদৃশ। শিং দুইটি বলদের তুল্য। আর হস্ত দুইটি বাঁদরের। ইহার এক হস্তে থাকিবে পয়গম্বর সোলেমানের আংটি, অপর হস্তে থাকিবে পয়গম্বর মুসার লাঠি। দাব্বাতুল আরদ অবিশ্বাসী-দের ললাটে ওই আংটি দ্বারা কালো চিহ্ন এবং বিশ্বাসীদের ললাটে ওই লাঠি দ্বারা শাদা চিহ্ন দাগিয়া দিবে। তাহার পর জুম্মাবার প্রত্যূষকালে আল্লাহ ফেরেশ্‌তা ইস্রাফিলকে শিঙায় ফুঁ দিতে বলিবেন। প্রথমে অতিক্ষীণ ধ্বনি, ক্রমশ সেই ধ্বনি বাড়িতে থাকিবে। মানুষসকল ভাবিবে, ইহা কিসের শব্দ? ক্রমে ক্রমে ইস্রাফিলের শিঙার ধ্বনি কানে তালা ধরাইয়া দিবে। দুনিয়া কাঁপিতে থাকিবে। পর্বতসকল ও মাটি পেঁজা তুলার মতন উৎক্ষিপ্ত হইবে। প্রাণিসকল মৃত ও নিশ্চিহ্ন হইবে। সমস্ত নিরাকার

শূন্যে পরিণত হইবে। শুধু থাকিবেন আল্লাহ এবং তাঁহার বান্দা ফেরেশতাবৃন্দ। আর আল্লাহ তখন ইস্রাফিলকে দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁ দিতে বলিবেন। এক্ষণে মৃত সকল প্রাণী, সকল মানুষ ও জিন পুনরায় জীবিত হইবে।···'

খোকা॥ দাদিজি, এই গুলতাপ্পি কে ঝেড়েছে বলো তো?

দিলরুখ বেগম॥ তওবা! আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌! খোকা, জবান সামলে কথা বল্‌! তুই বুজুর্গ পিরের খানদান!

কচি॥ খোকা, তুই হাফ-এজুকেটেড। গুলতাপ্পি বলছিস? পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হবে না? বিজ্ঞানের বইতে কী লেখা আছে জানিস? আর চারশো কোটি বছর পরে সৌরজগৎ ধ্বংস হবে।

খোকা॥ কচি, আমাকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করবি নে বলে দিচ্ছি। থাপ্পড় খাবি।

দি বেগম॥ কাজিয়া করে না ভাই-বোনে। ওই কেতাব আমার শ্বশুরসাহেবের লেখা। হরিণমারার বড়োগাজিসাহেব কলিকাতা থেকে ছেপে এনেছিলেন। দে, সিন্দুকে তুলে রাখি। আর একটা কথা বলি, কক্ষনো নাপাক হাতে সিন্দুক খুলবি নে! দে কেতাব-খানা!

কচি॥ দাদিমা, আমি পড়ব। আমার কাছে থাক। প্লীজ দাদিমা!

খোকা॥ এই মেয়েপণ্ডিত! তুই জানিস ইস্রাফিল কে? বল্‌ তো কে সে?

কচি॥ খোকা, বিছে ফলাবি নে আমার কাছে। ক্লাস নাইনে ফেল করা ছেলের মুখে 'ইস্রাফিল কে' এ প্রশ্ন মানায় না।

খোকা॥ তুই জানিসই না, ইস্রাফিলকে মুসলমান-রা বাইবেল থেকে চুরি করেছে। প্যাটপ্যাট করে তাকাস নে। আমার কাছে জেনে নে! ইস্রাফিল স্বর্গের মিউজিশিয়ান।

কচি॥ বাজে বকিস নে।

খোকা॥ বাজে? দাঁড়া, তোকে ছোটোদাদাজির একটা বই দেখাচ্ছি।

দি বেগম॥ খোকা! খোকা! সিন্দুক খুলিস নে আর। ও কচি, ওকে বারণ কর্‌!

কচি॥ দাদিমা, একটু চুপ করো না! ওর বিদ্যের দৌড়টা দেখি।

খোকা॥ এই ছ্যাখ। ছোটোদাদাজি আনডার-লাইন করে রেখেছেন।

কচি॥ এ তো ইংরিজি পদ্যের বই! এডগার অ্যালেন পো। কী অবাক! নামকরা কবি বুঝি?

খোকা॥ ছোটোদাদাজি পণ্ডিত লোক ছিলেন। একগাদা ইংরেজি বই ভরা আছে সিন্দুকে।

দি বেগম॥ ওই কেতাবগুলো জেহেলখানা (জেল) থেকে ওঁর ফাঁসির পর পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। যেদিন খবর এল—হা খোদা!

খোকা॥ আঃ দাদিজি! কান্নাকাটি থামাও। ইংরেজরা অসংখ্য লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। তাদের জন্য কাঁদবার লোক নেই।

কচি॥ আছে রে! শহিদ বলে স্ট্যাচু গড়েছে। মালা দিচ্ছে বার্থডেতে। শুধু ছোটোদাদাজির জন্য কিছু হয় না। হয়তো মুসলমান বলেই হয় না।

খোকা॥ ভ্যাট! ছোটোদাদাজি—আমার ধারণা, ফ্রীডম ফাইটার ছিলেন না, বুঝলি কচি? উনি ছিলেন অ্যানারকিস্ট্‌। বুঝিস কাদের অ্যানারকিস্ট্‌ বলে? যারা রাষ্ট্র বলে সরকার বলে কিছু মানে না। যারা বলে মানুষ বর্‌ন্‌-ফ্রী।

কচি॥ বুঝেছি। তুই পাঁচুবাবুর পাল্লায় পড়েছিস। খোকা, সাবধান কিন্তু। কামাল স্যার বলছিলেন, লোকটা এখানে এসে জুটেছে কোনো মতলবে। ওকে শিগগির পুলিশে ধরবে।

খোকা॥ তোদের কামালস্যারকে বলবি, প্রি-পার্টিশন পিরিয়ডে তো লিগের লিডার ছিল। এখন ভোল বদলে কংগ্রেস করছে কেন? গিরগিটির বাচ্চা!

বহুরূপীর দল গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে।

কচি॥ খোকা, যা-তা বলবি নে বলে দিচ্ছি। কামালস্যার না থাকলে আমার পড়াশুনো হত না।

দি বেগম॥ খোকা! আবার কোথায় বেরুচ্ছিস এই রোদ্দুরে?

খোকা॥ আসছি।…

কচি॥ দাদিমা!

দি বেগম॥ উঁ?

কচি॥ তুমি আমাকে বল নি সিন্দুকে এত কিছু আছে! গুপ্তধনের মতো আগলে রেখেছ। ভাগ্যিস খোকা সিন্দুক খুলল, তাই জানতে পারলাম। দাদাজির আব্বা বই লিখতেন, ছোটোদাদাজি ইংরিজি পদ্য পড়তেন! ভাবা যায় না।

দি বেগম॥ তোরা বুজুর্গ আলেমের খানদান, ভাই! কেতাবই তোদের সম্পত্তি। শ্বশুরসাহেব বলতেন, তুচ্ছ মাটির ওপর কেন লোভ মানুষের? বলতেন, মাটি আমার সয় না। তাই যা পেতেন, দুহাত ভরে বিলিয়ে দিতেন। ইচ্ছে করলে কত জমিজমার মালিক হতে পারতেন। হন নি। ওঁর কাছেই শিখেছিলাম মাটির কোনো দাম নেই।

কচি॥ কিন্তু বড়োদাদাজি? উনি তো সাতপুরুষের সম্পত্তি করে গেছেন—সেটা বলো!

দি বেগম॥ ভাসুরসাহেব বাপের এলেম কিছু পান নি। অন্য ধাতের মানুষ।

কচি॥ হুঁ, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পথে বসিয়ে—আর তোমার নিজের মায়ের পেটের বোনটিও বাবা আচ্ছা!

দি বেগম॥ ছিঃ কচি! মু বন্ধ্ কর্। বলতে নেই।…

Whose heart-strings are a lute

স্বাধীনবালা তার বাবার খুনীকে খুন করতে চায় এবং আমার কাছে একটা পিস্তল চাইতে এসেছিল! এই কথাটা যখনই ভেবেছি, বুকের ভেতর কী একটা নড়ে উঠেছে। মেয়েরা কেন আমার কাছে নালিশ জানাতে আসে ভেবে পাই নি। কাল্লু সাতমারের বউ সিতারা বেগমও এক জ্যোৎস্নারাতে অন্য ভাষায় এমন একটা নালিশ তুলেছিল। কী আছে আমার মধ্যে, বুঝি না। যেন তারা ভাবে, এই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন পৃথিবীকে অর্থপূর্ণ আর উদ্দেশ্যময় করার জন্য দু-একটা মানুষ দরকার। তাই হয়তো পির-বুজুর্গ-পয়গম্বর-সাধুসন্ত-মহাত্মা-নেতাদের দরকার হয়। কথাটা পরে খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছি। দেবনারায়ণদার এই নয়া আবাদের প্রায় শুরু থেকে আমি আছি। প্রথম-প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, এখানে যত-সব মানুষ এসে জুটেছে, বা জুটছে, তারা নিছক মাটির লোভে লোভী। ক্রমশ একটা আমূল রদবদল ঘটতে থাকল ওদের মধ্যে। মাটি পাওয়ার পর ওরা যেন এই বেঁচে থাকার—এই জীবনের এবং তার পারিপার্শ্বস্বরূপ এই পৃথিবীর ওপর কোনো একটা অর্থ আরোপ করতে চাইল। বাঁধ আর উঁচু ঢিবির ওপর দু বছরের মধ্যে যেসব বসতি গড়ে উঠল, দেবনারায়ণদা সেগুলোর নাম রাখলেন কেশবপল্লী, শিবনাথপল্লী, দেবেন্দ্রপল্লী, বিজয়পল্লী, আনন্দপল্লী। এসব নাম কেন? জিগ্যেস করলে দেবনারায়ণদা আমাকে দু ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা কিংবা চার ঘণ্টা ধরে নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের পন্থা, তারপর এই পথে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের পিদিম হাতে (যেহেতু পৃথিবী 'অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন') হেঁটে চলেছেন, তাঁদের নামগুলো জেনে রাখতে বললেন। শুধু বললেন না, কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেও দিলেন: "কেশবচন্দ্র সেনের নামে কেশবপল্লী, শিবনাথ শাস্ত্রীর নামে শিবনাথপল্লী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে দেবেন্দ্রপল্লী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে বিজয়পল্লী এবং আনন্দমোহন বসুর নামে আনন্দপল্লী।" তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, কিন্তু তুমি লক্ষ করছ নিশ্চয়, আমাদের আদি পথপ্রদর্শক ও পরম গুরু রাজা রামমোহন রায়ের নামে কোনো পল্লী স্থাপন করি নাই। বিস্মিত হয়ো না। নুরপুর রেশমকুঠির নিকট অনাবাদি ত্রিশ বিঘা ডাঙ্গা জমি স্ট্যানলি সায়েবের কাছেই শীঘ্র বন্দোবস্ত নিচ্ছি। ওই স্থানে রামমোহনপল্লীর অঙ্কুরোদ্গম হবে। পাশেই বাদশাহি সড়ক। কাজেই একটি হাটও স্থাপন করব। এই ব্রহ্মপুরের কিছু সমস্যা আছে। স্থানটি নিম্নভূমি হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা প্রবল। পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরে বাদশাহি সড়ক। তুমি জান, সড়ক জাতীয় সম্পদের তুল্য। যেহেতু অধিকসংখ্যক লোকালয় ও মনুষ্যগণের মধ্যে সড়ক যোগসূত্র স্থাপন করে। শফি, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। দেবনারায়ণদা কথায়-কথায় সংস্কৃত শ্লোক বা ফারসি বয়েৎ আওড়ান। কথার শেষে এই ফার্সি বয়েৎ মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন:

কিশ্‌তি শিকস্ত্‌ গোঁয়েম আয় বাদ্‌-এ তুর্তা বরখেজ
বাশর্‌কে ওয়জ্‌ বিন্‌য়েম দিবার-এ আশনারা…

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে পিরজাদা! কিছু বুঝলে? আস্তে বললাম, আমি ফারসি জানি না। দেবনারায়ণদা উদাত্তস্বরে বললেন, কবি হাফিজ বলছেন: 'নৌকায় উঠে বসেছি। হে অনুকূল বায়ু! প্রবাহিত হও। সেই প্রিয় বন্ধুর দর্শন পেতে পারি যাতে।'

বাদশাহি সড়ক! কথাটা যতবার শুনেছি, বারিচাচাজির সেই কালো ঘোড়াটার হ্রেষা আর খুরের শব্দে আক্রান্ত হয়েছি। ইচ্ছে করেছে, এখনই ছুটে যাই, ফিরে যাই মৌলাহাটে। মায়ের জন্য ছটফট করেছি। আয়মনিখালার জন্য মন কেমন করেছে। অথচ তারপর অনিবার্যভাবে রুকুর কথা মনে পড়েছে। অর্ধমানব অর্ধপশু এক উদ্ভট প্রাণীর কবলে হরিণের মতো কিশোরী! হোক না আমার সহোদর ভাই, ঘৃণা আমাকে তেতো করে ফেলেছে। পালিয়ে যেতে পারে নি রুকু? পারে নি তার মায়ের মতো ঝুলে পড়তে?…এইসব চিন্তার মধ্যে একদিন স্বাধীনবালা এসে বলল, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, শফিদা?

একটু হেসে বললাম, কিছু না। তুমি—

থামলে যে? কী?

তুমি ইদানীং উপাসনাসভায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ কেন, স্বাধীন?

দেবুজ্যাঠা বলছিলেন কিছু?

না। আমার চোখে পড়েছে।

তুমি আমার দিকে অত লক্ষ রাখ কেন?

একটু চমকে ওর চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, হয়তো আমার ভয় হয়, তুমি তোমার বাবার মতো একটা কিছু করে বসবে।

করতে তো ইচ্ছে করে। স্বাধীনবালা শক্ত মুখে বলল। তারপর চাপা শ্বাস ফেলল। দৃষ্টি দূরে রেখে ফের বলল, মায়ের এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। মা ঠাকুরদেবতা ছেড়ে নিরাকার ভজনা করতে চায় না। পালিয়ে যেতে বলে কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই।

স্ট্যানলিকে খুন করার জন্য?

স্ট্যানলিকে খুন করার জন্য।

হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। স্বাধীনবালা রাগ করে বলল, তুমি আমাকে কী ভাব? আমি খুব সামান্য মেয়ে নই। বাবা বলতেন, আমার মধ্যে ছেলেদের স্বভাব আছে।

লক্ষ করেছি বটে!

এদিন আকাশ ছিল মেঘলা। ভাদ্র মাস। গুমোট গরম। ব্রহ্মোপাসনামন্দিরের পাশে খালের ধারে একটা বটতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। খালের ওপারে নতুন আবাদের মাঠে টুকরো-টুকরো সবুজ ধানখেতে এক ঝাঁক শাদা বক দাঁড়িয়ে ছিল। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হলে বটের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়ালাম। স্বাধীনবালা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজছিল। বলল, তুমি দেবুজ্যাঠাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছ কি?

বললে নিশ্চয় টের পেতে। কিন্তু তুমি ভিজছ কেন?

ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি মুসলমান বলে তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর স্বাধীন ?

স্বাধীনবালা চমকে উঠল। আস্তে বলল, হঠাৎ একথা তুমি ভাবলে কেন ? আশ্চর্য তো !

লক্ষ করেছি, তুমি সব সময় একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বল ! তা ছাড়া তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ, তবু এখানে আসছ না।

স্বাধীনবালা এবার হাসল। ওর দুচোখে যেন কৌতুক ঝিলিক দিল। নির্লজ্জ ভঙ্গিতে বলে উঠল, মুসলমান বলে নয়। তোমাকে আমার কেন যেন ভয় করে।

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। অবশ্য বৃষ্টিটা বাড়ছিল। সে মন্দিরের পেছন ঘুরে চাতালে উঠলে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। চোখ ঝলসে দিল বিদ্যুৎ। আবার মেঘ গর্জে উঠল। আমি গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাগে দুঃখে অভিমানে অস্থির। এই মেয়েটির মধ্যে সিতারার অনেকখানি আছে। কিন্তু সিতারাকে আমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। স্বাধীনবালাকে ভালোবাসার কথা ভাবাও যায় না। ও হিন্দু আমি মুসলমান বলে নয়, কী একটা কঠিন আর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে বলে চিন্তা হয়। সেটা কি ওর পুরুষালি হাবভাবের জন্য ? সত্যি বলতে কী, ইন্দ্রাণীতে বেহুলা নদীর পারে জঙ্গলের ভেতর এক আদিম মেয়ে আসমা খাতুনের শরীর আমার পবিত্র রক্তে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তার জ্বালা এখনও ঘোচে নি। অসংখ্যাসংখ্য মেয়ের পায়ের তলায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করত, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো ! আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে আব্বার মতো তাকিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতাম, মহান ফেরেশতাবৃন্দ ! আমাকে ক্ষমা করুন ! এই ব্রাহ্ম উপাসনামন্দিরে ভিড়ের মধ্যে বসে মনে মনে বলতাম, পরমেশ্বর ! আমাকে ক্ষমা করুন !

বৃষ্টি থেমে গেলে দেবনারায়ণদার ঘরে গেলাম। উনি বিছানায় রাশীকৃত ছড়ানো বই আর পত্রপত্রিকার মধ্যে বসে ছিলেন। মুখটা গম্ভীর। আমাকে দেখে বললেন, বসো শফি ! একটা আনন্দসংবাদ, গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাখানি আশা করি তুমি নিয়মিত পাঠ কর ?

বললাম, করি। ইনডিয়ান মিরর, বামাবোধিনীও পড়ি।

আমার কথার ওপর দেবনারায়ণদা বললেন, তোমাকে সংস্কৃত সাহিত্যও পড়তে হবে।

পড়ছি। ইদানীং আমি লাইব্রেরিতেই দিন কাটাই।

ইংরাজি সাহিত্যও পড়ছ তো ? বিশেষ করে ইউরোপীয় দর্শন তোমার সম্যকভাবে পাঠ করা প্রয়োজন।

পড়ছি। মানে চেষ্টা করছি বুঝতে। শাস্ত্রীজী, ভূপতিদা এঁরা আমার শিক্ষক।

দেবনারায়ণদার গম্ভীর মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হল। বললেন, এইবার পরবর্তী প্রকল্পনার কথা বলি। আগামী মাঘোৎসবে মহাপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ব্রহ্মপুরে পদধূলি দেবেন। তাঁর সঙ্গে আসবেন মৌলুবি আফতাবউদ্দিন আহমদ।

তিনি কে ?

তোমারই মতো আমাদিগের এক মুসলমান ব্রাহ্ম ভ্রাতা। দেবনারায়ণদা আরও উজ্জ্বল মুখে বললেন, ওই সময় ব্রহ্মপুরের এই আশ্রমের পুনর্বিন্যাস ঘটাব। খুলে বলি। ইংরাজি পুস্তকে সেমেটিক ধর্মসমূহের ইতিহাস পাঠ করে একটি তথ্য অবগত হলাম। ইহুদিগণের কৃষিজনপদকে বলা হয় কিবুৎস্। ইংরাজিতে বলে কমিউন। কিছুকাল আগে কলিকাতাস্থ কলুটোলা স্ট্রীটে অনুরূপ একটি কমিউন ব্রাহ্মভ্রাতৃবৃন্দ স্থাপন করেছেন। কিন্তু নগর অপেক্ষা কৃষিজনপদেই এই ব্যবস্থা শিকড় পুঁততে সক্ষম হবে বেশি। কলুটোলার কমিউনটির নাম দেওয়া হয়েছে আশ্রম। আমরাও ব্রহ্মপুর আশ্রম—না, বরং 'ব্রহ্মপুত্র সমবায় আশ্রম' নাম দেব। কী বল ?

ভালোই তো !

উত্তেজনায় দেবনারায়ণদা আমার হাত ধরলেন। বসিয়ে দিয়ে বললেন, ব্রহ্মপুরে আমার ব্যবস্থাপনায় যে-সকল ভূ-সম্পত্তি আছে, ব্রাহ্ম ভ্রাতাভগ্নীদের তাতে সমানাধিকার থাকবে। তাঁতবস্ত্র এবং অন্যান্য কুটির-শিল্প গড়া হবে। সমস্ত-কিছুর আয় সমবায় তহবিলে ন্যস্ত হবে। কারুর নিজস্ব কিছু থাকবে না। সকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আশ্রম যোগাবে। একত্র রন্ধনশালা, একত্র খাদ্যপরিবেষণ, বস্ত্রবণ্টন, ঔষধাদিদান—বুঝেছ ?

হৃদয়নাথ শাস্ত্রী, ভূপতিরঞ্জন মিত্র, ব্রহ্মানন্দ মণ্ডল, গিয়াসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ একটা দল কেউ ইংলিশ ছাতা, কেউ দেশী তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে এসে পড়লেন। নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। লম্বা বারান্দা দিয়ে আমার ঘরে গেলাম ভিজে কাপড় বদলাতে। লাইব্রেরির পাশে একটা স্বল্পপরিসর ঘর। একটি তক্তাপোশে বিছানা। দেবনারায়ণদার দেখাদেখি বিছানায় বইপত্র ছড়িয়ে রাখি। দরজায় তালা দেওয়ার দরকার হয় না। শেকল তোলা থাকে মাত্র। ঘরের দরজা খোলা। মেঘবৃষ্টির দরুন ভেতরটা আবছা। একটু অবাক হলেও ব্যস্ত হই নি। চুরি করার মতো কিছু নেই আমার ঘরে।

কিন্তু চমকে উঠতে হল। জানালার পাশে বসে স্বাধীনবালা বৃষ্টি দেখছে ! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখে সে ঘুরে বলল, নিজের ভয় ভেঙে দিতে ট্রেসপাস করলাম। ইংরিজি বইয়ে পড়েছি 'ট্রেসপাসার্স্ উইল বি প্রসিকিউটেড।' দেখা যাক।

গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি আমাকে যেমন, তেমনি নিজেকেও বিপদে ফেলতে চাও, স্বাধীন ! এটা খুব বাড়াবাড়ি।

স্বাধীনবালা পালটা চটে গিয়ে বলল, আমি তোমার প্রেমে পড়ি নি। আমার সব সময় মনে থাকে, তুমি ব্রাহ্ম হও, কী যাই হও, তুমি মুসলমান। আর আমিও হিন্দু।

বেশ তো ! তাহলে এভাবে মুসলমানের ঘরে কেন ঢুকেছ ?

ওই যে বললাম, নিজের ভয় ভাঙাতে।

এটা খুব বিপজ্জনক খেলা, স্বাধীন !

বলে আমি লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালাম। স্বাধীনবালা আস্তে ডাকল, শফিদা ! শোনো, কথা আছে।

বলো !

তুমি হাজারিলালকে চেন ?

হ্যাঁ। কেন ?

তুমি নিশ্চয় জান না ওর নাম হাজারিলাল নয় ?

বলো কী ?

কাউকে বলবে না কিন্তু। ওর আসল নাম হরিনারায়ণ ত্রিবেদী। ও ব্রাহ্মণ। এখানে হাজারিলাল নামে হিন্দুস্থানি সেজে আছে। স্বাধীনবালা আরও চাপা স্বরে বলল, হরিদা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। ওর কাছে পিস্তল আছে। কাউকে বোলো না। আর শোনো, হরিদা বলেছে, ওর পায়ে চোট লেগেছে। খুঁড়িয়ে হাটে, দেখ নি ?

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। বললাম, হঠাৎ এসব কথা আমাকে বলতে এলে কেন ?

হরিদা স্ট্যানলিকে মারবে। কিন্তু সঙ্গে একজন সাহসী লোক চায়।

একটু হেসে বললাম, তুমি তো আছ।

না। একজন পুরুষমানুষ চাই ওর। আমি ওকে তোমার কথা বলেছি। সন্ধ্যায় যখন সবাই মন্দিরে যাবে, তুমি ঘরে থেকো। ওকে ডেকে আনব। থাকবে কিন্তু।

স্বাধীনবালা চলে গেল। ভাগ্যিস বারান্দা এবং অন্য কোথাও এসময় কেউ ছিল না। চোখে পড়লে কী ভাবত, জানি। কিছুক্ষণের জন্য একটা দুর্ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সত্যি বলতে কী, এখানে আমারও থাকা হাজারিলালের মতো থাকা।

একজন ফেরারির অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন। আসলে আমি একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। দেবনারায়ণ রায়ের আশ্রয় আর সাহচর্যে দিনেদিনে আমার ভেতর একটা রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, জীবনের কোনো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে – যা বুঝে ওঠার জন্য একটা বয়স দরকার। দরকার একটা অনুকূল পরিবেশ। সেই বয়স আর পরিবেশ এতদিনে পেয়ে গেছি। আবছা টের পাচ্ছি দেবনারায়ণদা যাকে 'কর্মযজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন, তার মধ্যে 'আনন্দের' স্বরূপ এবং 'অব্যক্তের ব্যক্ত' হওয়ার ব্যাপার আছে। আর কী আশ্চর্য মিল ঈশোপনিষদ গ্রন্থের এই শ্লোকের সঙ্গে মুসলমানদের নামাজের সঙ্গে উচ্চারিত দোয়াটিতে, আব্বা যার একই ব্যাখ্যা করতেন :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং…

না। আমি ধার্মিক নই। ব্রাহ্ম মুসলমান নই। মুসলমানও নই আর। বারিচাচাজি আমার মাথায় সেই যে কবে 'নেচার' ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তাই আমাকে গিলে খেয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নাকি ছেলেবেলাতেই 'পরম সত্য' টের পান। আমিও কি পেয়েছিলাম? সেই যেদিন উলুশরার মাঠে গাড়ির সারির পেছনে আসতে-আসতে একলা হয়ে গেলাম, আর তৃণভূমিতে প্রকৃতির রহস্যময় সংগীত শুনতে পেলাম :

Whose heart-strings are a lute…

কেউ ফিসফিসিয়ে উঠল, শফিদা! হরিদা আসছে! আবছা আলো-আঁধারে মিলিয়ে গেল একটি মেয়ে। মন্দিরের দিক থেকে দেবনারাণদার গম্ভীর গলায় বেদমন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। বিলিতি বাতি জ্বলছে। দরজার সামনে আবছা একটা মূর্তি এসে পরিচিত গলায় বলল, সেলাম শফিসাব!

হাজারিলালকে একটু সন্দেহের চোখে যে না দেখতাম, এমন নয়। সে থাকে কেশবপল্লীতে। তার ভাঙা হিন্দুস্থানি কথাবার্তায় দু-একটা ভদ্রলোকসুলভ শব্দও শুনেছি। কিংবা রহস্যময় তার একলা থাকার স্বভাব। দেখা হলেই ধান বা গমের খেত থেকে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, সেলাম শফিসাব!

সে কিনা এক হরিনারায়ণ ত্রিবেদী! শুনেছি ত্রিবেদীরা নাকি আসলে পশ্চিমে বামুন। বাঙলা-মুলুকে তারা চলে এসেছে। হ্যাঁ, হাজারিলালের হিন্দুস্থানিতে কথাবার্তা বলার হক আছে, সে হরিনারায়ণ ত্রিবেদী যখন। বললাম, আসুন, দাদা!

হরিনারায়ণ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে বসলেন। বয়সে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়োই হবেন। একটু চুপচাপ থাকার পর বললেন, আপনি আমার পরিচয় জেনেছেন। আমিও কিন্তু আপনার পরিচয় জেনেছি। তবে আমার এভাবে লুকিয়ে থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে। আপনার কী উদ্দেশ্য ভাই?

চমকে উঠেছিলাম। বললাম, আমার পরিচয় তো সবাই জানে। আমি এক পিরসাহেবের ছেলে, সে তো সবাই জানে।

হরিবাবু একটু হাসলেন। বললেন, এখন যদি তুমি বলি, রাগ করবেন? আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ।

খুশি হয়ে বললাম, নিঃসংকোচে তুমি বলতে পারেন। আমিও আপনাকে হরিদা বলব।

তুমি কৃষ্ণপুরের নাম শুনেছ?

না। কেন?

কৃষ্ণপুরের জমিদার অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী আমার বাবা। আমার বোন রত্নময়ীকে নাকি ভূতে বা জিনে পেয়েছে। নায়েব গোবিন্দরাম সিংহের সঙ্গে দুমাস আগে দৈবাৎ আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ। কাজেই আমার কথা গোপন রাখবেন বলে বিশ্বাস করি।

হরিবাবু চাপা শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, আমি পিতৃদ্রোহী—নানা কারণে। আমার পিতৃদেব ইংরেজের পা-চাটা কুকুর। যাই হোক, গোবিন্দদার কাছে

খবর পেলাম, রত্নময়ীকে নিয়ে উনি মৌলাহাটে এক পিরসাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। সেই পিরসাহেব কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাকে বলেছেন, তাঁর ছোটো ছেলে শফি লালবাগ টাউনে লেখাপড়া করত। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তাঁর অনুগত জিনদের খুঁজতে পাঠিয়েছেন—

হাসতে-হাসতে বললাম, তারপর?

হরিবাবুও হাসছিলেন। বললেন, তবু গোবিন্দদাকে তিনি অনুরোধ করেছেন, যদি দৈবাৎ শফির খোঁজ কোথাও পান, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

হাসি থেমে গেল আমার। আস্তে বললাম, আপনি গোবিন্দবাবুকে কিছু বলেছেন?

নাঃ। হরিবাবু জোর দিয়ে বললেন। আমি একজন বিপ্লবী। কিছু নীতি মেনে চলি। স্বাধীনের বাবা যামিনী মজুমদার ছিলেন আমার দীক্ষাগুরু। …এক কাজ করা যাক। এখানে কথা বলা ঠিক নয়। চলো, আমরা মাঠের দিকে যাই।

দুজনে ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে বাঁশপাতার গেট খুলে একটা পোড়ো জমিতে পৌঁছুলাম। তারপর বাঁধে গিয়ে দেখলাম, সারাদিনের বৃষ্টিতে কাদা জমেছে। হরিবাবু বললেন, আমার ডেরায় যাওয়া যাক বরং।

বাঁধের পথে কিছুদূর চলার পর কেশবপল্লী। বাঁধের একদিকে টুকরো-টুকরো ঢিবির ওপর মাটি বা ছিটেবেড়ার ঘর। কোনো-কোনো ঘরের দাওয়ায় আলো জুগজুগ করছিল। চাপা গলায় লোকেরা কথা বলছিল। কুকুর ডাকতে থাকল। আকাশে সামান্য মেঘ। মাঝে-মাঝে চাঁদ বেরিয়ে পড়ছে। লক্ষকোটি পোকামাকড় ডাকছে। এক আশ্চর্য অনুভূতি জেগে উঠল। সত্যিই 'এত প্রাণ এত গান আছে ভুবনে'! দেবনারায়ণদার 'পরমা প্রকৃতি'র অস্তিত্ব শুধু বীজের অঙ্কুরোদ্গমে, শস্যের বেড়ে ওঠায়, ফুলের প্রস্ফুটনে, দিন-রাত্রি-মাস-ঋতুচক্র-আবর্তনে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাণের চিৎকারেও তার স্পন্দন। কেন ওই চিৎকার? কিসের ডাকাডাকি? হরিবাবু বললেন, এই আমার ডেরা। একটু দাঁড়াও। লণ্ঠন জ্বালি। পা ধুতে হবে।

ছিটেবেড়ার ঘরের ভেতর একটি খাটিয়ায় জীর্ণ খেজুরতালাই বিছানো আছে। একখানা তুলোর কম্বল ভাঁজ করা আছে নোংরা বালিশের ওপর। কোনার দিকে মাটির হাঁড়ি, সরা, একটি লোহার ছোট্ট কড়াই—এসব জিনিস। একটি কোদালের ওপর আলো পড়ে ঝকমক করছিল। কৃষ্ণপুরের জমিদারপুত্রের এই জীবন আমার ভেতর দিকে নাড়া দিচ্ছিল।

তুমি কিছু খাও, ভাই! তুমি আমার অতিথি।

হরিবাবুর কথা শুনে দ্রুত বললাম, না। এখন আমার খিদে নেই।

হরিবাবু ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছিলেন। একটু পরে বললেন, তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না। কাজের কথাটা সেরে নিই।

আমার সংবাদ জানতে আগ্রহ ছিল। তাই একটু হেসে বললাম, আপনার বোনের জিনটার কী অবস্থা?

হরিবাবুও হেসে ফেললেন। তুমি কি বিশ্বাস কর এসবে?

কী জানি! তবে বাবার অনেক ব্যাপার দেখেছি। রহস্যময় মনে হয়েছে।

রত্ন নাকি তোমার বাবার সঙ্গে আরবি ভাষায় তর্কাতর্কি করেছে—গোবিন্দদা বলছিলেন। প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল ওখানে। তিনদিন চেষ্টার পর নাকি জিনটা পালিয়ে গেছে। হরিবাবু হঠাৎ থেমে লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে কাউকে বললেন, কৌন বা?

কেউ নিচের জমি থেকে সাড়া দিল, আমি সুধন্য, হাজারিদা!

হরিবাবু বললেন, সুধন্য? ক্যা বে? কৌন কাম করছিস তু?

মাছলি—মাছ ধরছি হাজারিদা! 'বিত্তি' পেতেছিলাম, দেখি মাছ পড়ল নাকি।

ঠিক হ্যায়!

হরিবাবু ভেতরে ঢুকে বললেন, এখানে আসার পর আমার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রখর হয়েছে। উপরন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয় লাভ করেছি। অন্ধকারের প্রাণীদের মতো সবকিছু দেখতে পাই। শুনতে পাই। জানতে পারি কে শত্রু কে মিত্র।

সুধন্যকে আমি চিনি।

চিনবে। কে না চেনে ওকে? হরিবাবু বসে বললেন। ছেলেটা প্রাণীদের মতোই প্রকৃতির। ওর একটা গুণের কথা জান কি? ও অসাধারণ গান গায়। যে গ্রামে ওর বাড়ি ছিল, সেখানে নাকি বেহুলা-লখিন্দরের পালায় বেহুলা সাজত। দেবনারায়ণবাবুর কানে গেলে ওর একটা সদ্গতি হবে নিশ্চয়। কিন্তু তাহলে ওকে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে-গাইতে মারা পড়তে হবে। অর্থাৎ ওর মাঠেঘাটে ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। আচার্যদেবের হাতে বন্দী হতে হবে। হরিবাবু খিকখিক করে হাসতে লাগলেন।···

রক্ততিলক

'বাং ১২৯৯ সনের শুভ ১০ই বৈশাখ সন্ধ্যারাত্রে আমার প্রথম নরহত্যা। বহু বৎসর পরে জানিতে পারি, নরাধম পশু পান্না পেশোয়ারি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। একখণ্ড ইষ্টক বস্তুপিণ্ড মাত্র। উহা স্থাবর এবং অনড়। তুমি মনুষ্য। অস্থাবর ও গতিশীল। তুমি বস্তুপিণ্ডকে তোমার গতি দান করিতে সমর্থ। তুমি জান না, তোমার মধ্যে প্রকৃত অসীম গতিশক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। তুমি জীবনে ইহার তিলার্ধ কাজে লাগাইতে পার কিনা, দেখ। অবশ্যই পারিবে।···

'আর দেখ, প্রকৃতিতে সকল ঘটনাই উদ্দেশ্যপূর্ণ। তাই রক্ত ও অশ্রুর পৃথক-পৃথক মূল্য নাই। মূল্য-বিচারের তৌলদণ্ড নাই। উহা মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত। যে-কোনও ঘটনার দুইটি দিক আছে। একটি বিষয়গত, অপরটি বিষয়িগত। দ্বিতীয় দিক হইতে দেখিলেই দুঃখ ত্রাস অনুতাপ প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিক্রিয়া জাগিবে। প্রথম দিক হইতে হইলে বোধ হইবে, নিশ্চয় ইহা উদ্দেশ্যমূলক। তোমার অগোচর কোনও হিতের নিমিত্ত ঘটিয়াছে।···

'আমার দ্বিতীয় নরহত্যা বাং ১৩০২ সনের শুভ দোসরা আশ্বিন বৈকালে। নুরপুর বাম্বুককুঠিয়াল রিচার্ড স্ট্যানলি ওই দিবস ঘোড়া ছুটাইয়া দেবনারায়ণ রায়ের সন্নিধানে উপস্থিত হয়। স্বাধীনবালা হরিনারায়ণ এবং আমাকে সম্বাদ দেয়। হরিনারায়ণ এবং আমি যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া রওয়ানা হইতেছি, পশ্চাতে পদধ্বনি শুনি। ঘুরিয়া দেখি, স্বাধীনবালা দৌড়াইয়া আসিতেছে। তাহাকে রণরঙ্গিনী অথবা উন্মাদিনী বোধ হইতেছিল। সে বলিল, দাঁড়াও। তোমাদের জয়তিলক পরাইয়া দিই। তাহার হাতে একটি ছুরিকা ছিল। সে তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী চিরিয়া আমাদের দুইজনের ললাটে রক্তচিহ্ন আঁকিয়া কহিল, বন্দেমাতরম্! আমরা কহিলাম, বন্দেমাতরম্! সে দাঁড়াইয়া রহিল। যতদূর যাই, মাঝে মাঝে ঘুরিয়া দেখি, সে দাঁড়াইয়া আছে। হরিনারায়ণ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, ওই নির্বোধ যুবতী সর্বনাশ বাধাইয়া ছাড়িবে।···

'নুরপুর বাম্বুকের উদ্ধত সমুচ্চ ইষ্টকস্তম্ভটি বহুদূর হইতে দেখা যায়। শুনিয়াছি, উহা ষাট-সত্তর ফুট উচ্চ। কিছুদূরে নিম্নভূমিতে আমরা কাশবনের মধ্যে আত্মগোপন করিলাম। পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড আলি-পথ। উহা স্থানীয় লোকের মতে, 'কেদাররাজার আইল।' উহা নাকি একরাত্রে ওই রাজার উপাস্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডী কর্তৃক নির্মিত। স্ট্যানলি এই আলি-পথে ফিরিবে। এতদঞ্চলে সে টাংলিসাহেব নামে পরিচিত ছিল। শুনা যায়, ইংরাজি ১৭৪৪ সনে যে মেজর মনরো আড়াইশত বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের নলের মুখে বাঁধিয়া তোপের আগুনে উড়াইয়া দেয় (সেইটি ভারতবর্ষের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ), এই শয়তান স্ট্যানলি তাহারই বংশধর। ওই সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন। ইংরাজি ১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহের সময় স্ট্যানলির পিতা এতদঞ্চল হইতে একশত দুর্বৃত্ত দস্যু সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিতে বহরমপুরের ব্যারাকে উপস্থিত হয়। ওই মহাবিদ্রোহে আমার পিতামহ সিপাহীদের সহযোগিতা করায় তাঁহাকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইসব কথা আমি পিতামহী মরহুমা কামরুন্না বেগমের কাছে যখন শ্রবণ করি, তখন নিতান্তই বালক। সম্যক কিছু বুঝি নাই। এক্ষণে সেই কাহিনী মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। হরিনারায়ণ আমাকে একটি তলোয়ার দিয়াছিলেন। হরিণমারার বড়োগাজির তলোয়ারখানির ন্যায় সুদৃশ্য নহে। কিন্তু শান দিয়া অত্যন্ত ক্ষুরধার করা হইয়াছে।···

'হঠাৎ হরিনারায়ণ কহিলেন, এক কাজ করা যাউক। আলিপথে যতখানি সম্ভব গভীর করিয়া গর্ত খনন করি। শীঘ্র আইস। শালার আসিবার সময় হইয়াছে। তলোয়ার দ্বারা আমি লম্বালম্বি গর্ত খনন করিলাম। হরিনারায়ণ মাটি তুলিয়া সাহায্য করিলেন। কার্য প্রায় অর্ধেকের অধিক সম্পন্ন হইয়াছে, এমন সময় দিগন্তে অশ্বারোহী মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা বিদ্যুৎগতিতে নিম্নস্থ কাশবনে আত্মগোপন করিলাম। সূর্য অস্ত যাইতেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছিল। হরিনারায়ণ পিস্তলহাতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া আমি তলোয়ার বাগাইয়া ধরিলাম। স্ট্যানলির ঘোড়া গর্তের কয়েকহস্ত দূরে থমকিয়া দুই পা উর্ধ্বে তুলিল। সাহেব লাগাম টানিয়া ধরিয়াছিল। পরমুহূর্তে সে একটা কিছু অনুমান করিয়া দ্রুত পিস্তল বাহির করিল। অমনি হরিনারায়ণ 'বন্দেমাতরম্' গর্জন করিয়া তাঁহার পিস্তলের ঘোড়া টানিলেন। প্রথম গুলি সাহেবের কাঁধে, দ্বিতীয় গুলি ফসকাইয়া গেল। কিন্তু প্রথম গুলিতেই সায়েব ধরাশায়ী হইল। ঘোড়াটি সভয়ে চিত্রার্পিত দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব কাত হইয়া গর্তে পড়িয়াছিল। পিস্তল ব্যবহারের পূর্বেই আমি দুইহাতে তলোয়ার ধরিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিলাম। উপর্যুপরি আঘাতে সে নিশ্চল হইল। তথাপি আমার রক্তের নেশা ঘুচিল না। তাহার সর্বাঙ্গে তলোয়ারের কোপ মারিতে থাকিলাম। হরিনারায়ণ পিছন হইতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, শফি! শফি! লোক আসিতেছে। আমি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। হরিনারায়ণ স্ট্যানলির পিস্তলটি কুড়াইয়া লইলেন। কহিলেন, আইস! কাশবনের ভিতর দিয়া পলায়ন করি! আমার জামা-কাপড়ে স্ট্যানলির রক্ত। কিয়দ্দূরে গিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তখন আমার দেহ মৃতমনুষ্যবৎ, অনুভূতিহীন। শুধু ললাটে রক্ততিলক চড়চড় করিতেছে।···

'আর সেই মুহূর্তে একটি কথা ভাবিয়া শিহরিত হইলাম। সিতারার জন্য পান্না পেশোয়ারিকে আঘাত করিয়াছিলাম। এইবার স্বাধীনবালার জন্য স্ট্যানলিকে আঘাত করিলাম! নিয়তি বলিয়া সত্যই কি কিছু আছে?···'

যার হৃদয়তন্ত্রী একটি বীণা

কচি॥ দাদিমা, ঘুমোলে?

দিলরুখ বেগম॥ না ভাই! পোড়াচোখে নিঁদ নেই। কবরে গিয়ে আরামে নিঁদ যাব।

কচি॥ ফের আজেবাজে কথা? শোনো, আজ কামাল স্যারের কাছে ইংরিজি পদ্যটা বুঝে নিয়েছি। 'Whose heart-strings are a lute'! যার হৃদয়তন্ত্রী একটি বীণা। বুঝলে কিছু?

দি বেগম॥ আমি কী বুঝব? আমি কি তোর মতো লেখাপড়া জানি?

কচি॥ ছোটোদাদাজি একটা মেয়েকে ভালো-বাসতেন। হিন্দু মেয়েকে। তা জান তো?

দি বেগম॥ কচি, চুপ কর্। ওসব কথা থাক।

কচি॥ সত্যি! ছোটোদাদাজির একটা খাতা পেয়েছি সিন্দুকে।

দি বেগম ॥ ওঁর মতন বেদিল বেরহম (হৃদয়হীন নির্দয়) মানুষ কেউ ছিল না রে !

কচি ॥ কী বল, বুঝি না। যারা মানুষ খুন করে, তারা বুঝি কাউকে ভালোবাসতে পারে না ?

দি বেগম ॥ ওঁর জানে মুহব্বত বলে কিছু ছিল না। তুই চুপ কর্।

কচি ॥ তুমি চটে যাচ্ছ কেন ? আশ্চর্য তো !

দি বেগম ॥ রাত হয়েছে, ঘুমো।

কচি ॥ দাদিমা ! সেই রাখালছেলের গল্পটা বল নি কিন্তু। এখন বলো না !

দি বেগম ॥ আমার শ্বশুরসাহেবও—বলতে নেই, খুব বেরহম ছিলেন।

কচি ॥ সে কী ! কেন ? ও দাদিমা, কেন ওকথা বলছ ?

দি বেগম ॥ ছেলেটার একটা দোষ, বাঁশি বাজাত। বাঁশি শুনলে গোনাহ্। তাই—

কচি ॥ Whose heart-strings are a lute ! গল্পটা বলো !

(ক্রমশ

বাংলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণা

ওয়াকিল আহমদ

গবেষণা সমাজের বুদ্ধিজীবীর সেই অংশের কাজ যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, ধীমান এবং চিন্তাবিদ। একটি সমাজে গবেষণাবৃত্তির বিকাশে কতকগুলি পূর্বশর্ত থাকে—উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ভালো গ্রন্থাগার, উন্নত সংগ্রহশালা ইত্যাদি। আমাদের সমাজে সৃজনশীল সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ ছিল, কিন্তু যাকে ঠিক গবেষণা বলে সে জিনিসটি ছিল না। গবেষণার প্রধান বাহন গদ্য। যে ভাষায় গদ্য ছিল না, সে ভাষায় গবেষণাও ছিল না। আমরা উনিশ শতকে গদ্য পাই। গদ্য এলেও উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ভালো গ্রন্থাগার, উন্নত সংগ্রহশালা ছিল না। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত গোষ্ঠী তৈরি হয় বটে, কিন্তু গবেষক তৈরি হতে আরও সময় লেগে যায়। রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ বড়ো লেখক-শিল্পী-ঋষি-মনীষী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা গবেষক ছিলেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ পণ্ডিত এবং গবেষক পেতে সমাজকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সমাজ যথেষ্ট ম্যাচিয়োর না হলে সে-সমাজে গবেষক জন্মান না। একথা মনে রেখে আমরা নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে ভাষা-সাহিত্যের গবেষণার ধারা, মান এবং পরিমাণের বিষয় আলোচনা করব।

বাঙলা যখন বিভক্ত হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বয়স মাত্র ২৬ বছর। যেহেতু দ্বি-জাতিতত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে এই বিভাগ, সেহেতু বিভাগোত্তর কালে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর ঢাকা-কলিকাতা স্থান-বদল হয়। পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য ছিল। বিভাগোত্তর কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বিরান

ভূমিতে পরিণত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ দারিদ্র্য আরও প্রকট ছিল। পঞ্চাশের দশকে আমরা মাত্র তিনজন পণ্ডিত-গবেষকের সাক্ষাৎ পাই, যাঁদের বিভাগ-পূর্ব কালের শিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁরা হলেন ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৮), ডকটর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-৮১) ও অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। তাঁরা সবাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। শহীদুল্লাহ সংস্কৃতে অনা(র্)স্ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ., এনামুল হক আরবিতে অনা(র্)স্ এবং বাঙলায় এম. এ., এবং মনসুরউদ্দীন ফারসিতে অনা(র্)স্ ও এম. এ. পাশ করেন। শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এনামুল হক ও মনসুরউদ্দীন স্কুলে আর কলেজে বাঙলা সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন।

ডকটর শহীদুল্লাহ যথার্থ পণ্ডিত এবং জাত গবেষক ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করে ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে আমৃত্যু শিক্ষার এবং জ্ঞানের চর্চা করেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ভাষায় কাহ্ন ও সরহপাদের কবিতা সম্পর্কে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডি. লিট ডিগ্রী পান। ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ৪০ বছর নিরলসভাবে গবেষণায় নিযুক্ত থেকে ডকটর শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষায় আর সাহিত্যে একাধিক গ্রন্থ এবং শতাধিক প্রবন্ধ ইংরাজি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি চর্যাপদকর্তাদের জীবনী উদ্‌ঘাটন করে ও ভাষাতত্ত্বের আলোকে চর্যাপদের রচনাকাল পিছিয়ে সাত শতকের মধ্যভাগে নিয়ে যান। চর্যাপদের পাঠ এবং পাঠান্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের সমস্যা উদ্‌ঘাটনেও তাঁর মৌলিক চিন্তার এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড, ১৯৫৩ ২য় খণ্ড, ১৯৬৪) এবং 'বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯) ডকটর শহীদুল্লাহর বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর Budhist Mystic Songs (১৯৬০) নামে চর্যাপদের, আলাওলের রোমান্সকাব্য পদ্মাবতীর (১৯৫০) এবং মিথিলার বিদ্যাপতির ১০০টি পদের পাঠলিপি ও পদ্যানুবাদ 'বিদ্যাপতি শতকে'র (১৯৬৭) সম্পাদনা প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া, Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬১) নামে বাঙলা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থ প্রাচীন ঐতিহ্যের গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দুই খণ্ডে 'পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তাঁর মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল। ডকটর শহীদুল্লাহ ভাষার পুরাতত্ত্বের ও ঐতিহ্যের আলোচনায় স্বচ্ছন্দ এবং পারদর্শী ছিলেন। জ্ঞান এবং যুক্তি তাঁর তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি ছিল। ডকটর শহীদুল্লাহ নিজে গবেষক ছিলেন বটে, তবে গবেষক তৈরির, পত্রিকা প্রকাশের বা সংগঠন গড়ার কাজে তেমন মনোযোগ দেন নি। তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত, তুলনারহিত এবং সমান্তরালবর্জিত। বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি পঠন-পাঠন, অনুশীলন, আলোচনা, গবেষণা, এবং এসবের স্বার্থরক্ষায় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের কথা বিবেচনা করে তাঁর মৃত্যুর সময় বলা হয়েছিল একটি বিশাল বটগাছ পড়ে গেল। একটি বিশাল বটগাছের সাথেই ডকটর শহীদুল্লাহর তুলনা করা চলে।

মহম্মদ এনামুল হক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে A History of Sufism in Bengal শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ওই বছর "বঙ্গে সূফী প্রভাব" নামে এর বাঙলা ভাষান্তর কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। একই বছর তিনি আর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যুগ্মভাবে "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য" কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন। তাঁরা এভাবে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের এক অজানা খনির সন্ধান তুলে ধরেন। ডকটর এনামুল হকের একক প্রয়াসের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" (১৯৫৭)। এটি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে গ্রন্থ প্রকাশের সময় পর্যন্ত "বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে দিক এই পুস্তকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এতকাল একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।' তিনি জাতি বলতে মুসলিম জাতিকে বুঝিয়েছেন এবং গ্রন্থের নামানুসারে কেবল মুসলমান লেখকগণ এবং তাঁদের গ্রন্থসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষত মধ্যযুগের অর্ধশতের অধিক মুসলিম কবির নানা গ্রন্থের সন্ধানে এবং মূল্যায়নে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক অভাব দূরীভূত হয়েছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে এ-ধরনের আলোচনা এই প্রথম। ডকটর হকের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শাহ মুহম্মদ সগীর -বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' সম্পাদনা। এটি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে, 'ইউসুফ-জোলেখা' বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র এবং মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র মধ্যবর্তী আখ্যানধর্মী প্রেমকাব্য। উপরের গ্রন্থ দুটি ছাড়াও গবেষণামূলক বহুসংখ্যক প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগের মুসলমানের সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে ডকটর শহীদুল্লাহর সাথে তাঁর মিল আছে। পাকিস্তানি আসলে বাঙলার মুসলমানের আত্মানুসন্ধানের এবং পুনর্গঠনের প্রয়াস থেকে এ ধরনের বিষয় নির্বাচিত এবং আলোচিত হয়েছে। এ ধারা পরবর্তী কালে আরও প্রকট এবং প্রবল হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের সাহিত্য তথা সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ডকটর হক কোথাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেন নি।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "হারামণি", ১ম খণ্ড (১৯৩০) প্রকাশ করে লোকসাহিত্যগবেষণার অঙ্গনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত হারামণির মোট ১৪টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ডকটর দীনেশচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর হাতেখড়ি হয়। মনসুরউদ্দীন মূলত লোকসাহিত্যের অনুরাগী সংগ্রাহক তথা সম্পাদক। তাঁর রচিত "বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা" (১ম খণ্ড, ১৯৬০ ও ২য় খণ্ড, ১৯৬৪) আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। তাঁর গবেষকের অনুসন্ধিৎসা প্রবল, কিন্তু পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণশক্তি দুর্বল। এজন্য তাঁর গ্রন্থখানি তেমন গুরুত্ব পায় নি। বাঙলার মুসলমানের আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস থেকে ডকটর হকের অনুরূপ অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এরপর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে লনডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করেন, ১৯৫৪ সালে অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু ওই পদে বহাল ছিলেন। তিনি অধ্যাপনাকে এবং গবেষণাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। আবদুল হাই-এর কর্মধারা ছিল ত্রিমুখী—নিজে গবেষণা করা, গবেষক তৈরি করা, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা। তিনি ভাষাতত্ত্বের এবং ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে উভয় বাঙলায় গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" (১৯৬৪) এ সম্পর্কে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। তিনি ও সৈয়দ আলী আহসান যুগ্মভাবে "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" (আধুনিক যুগ, ১৯৫৬) প্রকাশ করেন। 'কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা

দপ্তরের পরিকল্পনা' অনুযায়ী গ্রন্থখানি রচিত, এজন্য এতে হিন্দু লেখক অপেক্ষা মুসলমান লেখক অধিক গুরুত্ব পেয়েছেন। এই মনোভাবের জন্য গ্রন্থখানি সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে খুবই দুর্বল এবং আদর্শহীন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল, বাহান্ন সালের ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। তবে পাকিস্তান সরকার এবং সরকারের মদদ-পুষ্ট এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরোধিতা করতে থাকে। সৈয়দ আলী আহসান তো বলেই ফেলেন, রাষ্ট্রের সংহতির স্বার্থে প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করব। ষাটের দশকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর যখন রাষ্ট্রীয় পীড়ন প্রবল হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ সিলেবাসে কাভারেজ দেওয়ার জন্য "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"কে "বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য", "চণ্ডীমঙ্গল"কে "কালকেতু-উপাখ্যান", "অন্নদামঙ্গল"কে "মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান", বৈষ্ণব পদাবলীকে মধ্যযুগের "গীতি-কবিতা" ইত্যাদি নাম দেওয়া হয় এবং দ্রুত সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ, আনোয়ার পাশা বাধ্য হয়ে এ-পথ অবলম্বন করেন।

বাঙলা বিভাগ থেকে নিয়মিত ষান্মাসিক গবেষণা-পত্র "সাহিত্য পত্রিকা" (১৯৫৭) প্রকাশ করা হাই সাহেবের প্রধান সাংগঠনিক কৃতিত্ব। পত্রিকাটি উচ্চ মানের দিক দিয়ে প্রথম থেকেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "সাহিত্য পত্রিকা" আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। "সাহিত্য পত্রিকা"র আদর্শে পরবর্তী কালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ বার্ষিক "সাহিত্যিকী" (১৯৬০), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ বার্ষিক "পাণ্ডুলিপি" (১৯৭০), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ বার্ষিক "ভাষা-সাহিত্য পত্র" (১৯৭৩), বাঙলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক "বাংলা একাডেমী পত্রিকা" (১৯৫৮), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ষান্মাসিক "বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা" (১৯৬৯) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের বার্ষিক "বাঙলা সাহিত্য পত্রিকা" (১৯৬৯) এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের বার্ষিক বাঙলা "বিভাগীয় পত্রিকা" (১৯৮১) একই আদর্শে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাগুলি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে এবং বহুজনের গবেষণাকর্মের প্রেরণার উৎস হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই এক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন।

উচ্চ গবেষণার নির্দেশক, পরামর্শদাতা এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আবদুল হাই সাফল্য এবং সম্মান অর্জন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশনায় যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রী পান, তাঁরা হলেন নীলিমা ইব্রাহিম, আনিসুজ্জামান, গোলাম সাকলায়েন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম এবং বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক। তাঁরা যেসব বিষয়ে গবেষণা করে ওই ডিগ্রী লাভ করেন সেসব হল যথাক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটক ও বাঙ্গালী সমাজ (১৯৫৯), ইংরেজ আমলে বাঙলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯৬২), বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য (১৯৬২), আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৯৬৯), নজরুল ইসলাম : জীবন ও কাব্য (১৯৭৮), এবং বাঙলা লোকসাহিত্যে বাঙালীর সমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি (১৯৭২)। একই নামে অথবা নাম পরিবর্তিত করে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবীণতার এবং গুরুত্বের বিচারে এর পর ডকটর আহমদ শরীফের নাম করা যায়। আহমদ শরীফ ১৯৫০ সালে গবেষণা সহকারী হিসাবে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করেন এবং

একাদিক্রমে ৩৪ বছর চাকুরি করার পর ১৯৮৪ সালে প্রফেসর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 'পুথির কুবের' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্ভবত সে-সুবাদে তিনি মধ্যযুগের পুথির সম্পাদনা এবং গবেষণাকর্মে অধিক মনোযোগী হন। তিনি এ পর্যন্ত ছোটো-বড়ো প্রায় ৩৫খানি পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেন, এবং ২৩ খানি গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী আকারে সেগুলি প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি একটি তালিকায় এভাবে দেখা যায় :—

১। লায়লী-মজনু, দৌলত উজির বাহরাম খান, ১৯৫৭
২। তোহ্‌ফা, আলাওল, ১৯৫৭
৩। পুথি-পরিচিতি, ১৯৫৮
৪। সত্য-কলিবিবাদ-সংবাদ, ১৯৫৯
৫। মধুমালতী, মুহম্মদ কবীর, ১৯৬০
৬। মুসানামা, মুহম্মদ আকীল, ১৯৬০
৭। নীতিশাস্ত্রবার্তা, মুহম্মদ মুজাম্মিল, ১৯৬০
৮। মুসলিম কবির পদসাহিত্য, ১৯৬০
৯। মধ্যযুগের গীতিকবিতা (সংকলন), ১৯৬১
১০। মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ (সংকলন), ১৯৬২
১১। রাগতালনামা ও পদাবলী, ১৯৬৩
১২। রসুলবিজয়, জয়নুদ্দীন, ১৯৬৩
১৩। শাহ বারিদ খানের গ্রন্থাবলী, ১৯৬৬
১৪। পুথির ফসল, ১৯৬৬
১৫। চন্দ্রাবতী, মাগন ঠাকুর, ১৯৬৭
১৬। মধ্যযুগের রাগতালনামা, ১৯৬৭
১৭। বাংলার সুফী সাহিত্য, ১৯৬৯
১৮। নসিহতনামা, আফজাল আলী, ১৯৬৯
১৯। সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, ১৯৭২ (থিসিস)
২০। হিন্দু কবির পদসাহিত্য, ১৯৭৩
২১। সয়ফুলমুলক্ বদিউজ্জামাল, দোনাগাজী চৌধুরী, ১৯৭৫
২২। সওয়াল সাহিত্য, ১৯৭৬
২৩। সিকান্দরনামা, আলাওল, ১৯৭৭

এ ছাড়া, "বাউলতত্ত্ব" (১৯৭৩), "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ" (১৯৭৭) ও "বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য" (২ খণ্ড, ১৯৭৮, ১৯৮৩) নামে তিনখানি গবেষণাগ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিষয়ে অর্ধশত গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। "বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য" তাঁর 'ম্যাগনাম ওপাস্' বা শ্রেষ্ঠকীর্তি। এটি প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস। তিনি গ্রন্থের 'নিবেদনে' বলেন, 'মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের সাহিত্যের শতোর্ধ্ব ইতিহাস রচিত হলেও, আজও মধ্যযুগের কিংবা আধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্যের একটিও পূর্ণাবয়ব ইতিহাস প্রণীত হয়নি। তার কারণ কোলকাতাস্থ ইতিহাসকারগণ মুসলিম রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন জিজ্ঞাসু নন।...ঢাকায়ও তেমন কোন ইতিহাসকার শ্রমসাধ্য এ কাজে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন নি।...আমরা এ গ্রন্থে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ চেহারা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।' (২য় খণ্ড, পৃ. সাত-আট)। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকল বাঙালি কবিকে উপযুক্ত মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই দাবি যথার্থ। বুদ্ধি আর যুক্তি আহমদ শরীফের চিন্তার বাহন। তিনি গবেষণাকর্মে সফল, কিন্তু গবেষক সৃষ্টিতে ব্যর্থ। ৩২ বছরের অধ্যাপনা-জীবনে মাত্র চার জন স্কলার তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁরা হলেন নাজমা জেসমিন চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, এস এম লুৎফর রহমান ও মোহাম্মদ বদিউজ্জামান। তাঁরা যথাক্রমে "বাঙলা উপন্যাস ও রাজনীতি" (১৯৭৯), "রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক" (১৯৭৭), "বাউল সাধনা ও লালন শাহ" (১৯৭৯) এবং "ইসমাইল হোসেন সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য" (১৯৮১) অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। নাজমা জেসমিন

চৌধুরী একমাত্র গবেষক যিনি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলা উপন্যাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কলিকাতার চিরায়ত প্রকাশনী এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ডকটর আহমদ শরীফ সাংগঠনিক ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। মধ্যযুগের পুথি-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি নিজেই একটি 'স্কুল'; তাঁর কোনো অনুসারী বা উত্তরাধিকারী নেই।

পঞ্চাশের দশকে আর তার কিছু আগে এম. এ. পাশ করে যাঁরা অধ্যাপনা এবং গবেষণাকর্মে রত আছেন তাঁদের মধ্যে ডকটর কাজী আবদুল মান্নান, ডকটর কাজী দীন মুহম্মদ, ডকটর মযহারুল ইসলাম, ডকটর নীলিমা ইব্রাহিম, ডকটর আনিসুজ্জামান, ডকটর আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, ডকটর মোস্তাফা নূর-উল ইসলাম, ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী, ডকটর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডকটর আবদুল কাইউম, ডকটর গোলাম সাকলায়েন, ডকটর আবদুর রহীম, ডকটর আবদুল আউয়াল, ডকটর মোহম্মদ মনিরুজ্জামান, ডকটর রফিকুল ইসলাম, ডকটর আলাউদ্দীন আল আজাদ, ডকটর সনজীদা খাতুন, ডকটর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ দেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ডকটরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। এর সাথে শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহীদ আনোয়ার পাশা, সৈয়দ আলী আহসান, বদরুদ্দীন উমর, মোবাশ্বের আলী প্রমুখের নাম যুক্ত করলে তালিকা পূর্ণ হয়। কাজী আবদুল মান্নান, মুনীর চৌধুরী, অনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, বদরুদ্দীন উমর—এঁদের রচনায় ধার এবং ভার আছে। ডকটর মান্নান The Emergence and Development of Dobhasi Literature (১৯৬৫) নামক অভিসন্দর্ভ রচনা করে লনডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি ডিগ্রী পান। "আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা" (১৯৬১) তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর এবং ডকটর অনিসুজ্জামানের "মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য" (১৯৬৪) কমবেশি একই সময়ের মুসলমানের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণমূলক গবেষণাগ্রন্থ। ডকটর মান্নান সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে মার মশাররফ হোসেনের রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন। ডকটর আনিসুজ্জামানের "মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র" (১৯৬৯) দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং "আঠার শতকের পুরোনো গদ্য" (১৯৮৭) তৃতীয় গ্রন্থ। ঢাকা ও অন্যান্য ফ্যাকটরির চিঠিপত্র ও নথির ভিত্তিতে রচিত তৃতীয় গ্রন্থখানি আধুনিক বাঙলা গদ্যের ক্ষেত্রে অভিনব সংযোজন। তিনি বাঙলা গদ্যের সীমানা বাড়িয়ে উনিশ শতক থেকে আঠারো শতকে নিয়ে গেছেন। ডকটর মান্নানের ও ডকটর আনিসুজ্জামানের গবেষণার বৈশিষ্ট্য হল—গবেষণাকে উদ্দেশ্যের বাহন না করে সত্যের বাহন করা।

মুনীর চৌধুরীর ৩খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা—"মীর মানস" (১৯৬৫), "বাঙলা গদ্যরীতি" (১৯৭০) এবং "তুলনামূলক সমালোচনা" (১৯৬৯)। তিনি ইংরেজি আর বাঙলা সাহিত্যের এম. এ. ছিলেন। এজন্য তুলনামূলক আলোচনা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। এ ধরনের গবেষণায় তিনিই পথিকৃৎ এবং একক ব্যক্তিত্ব। মফস্বলে থেকে মোবাশ্বের আলী এ ধরনের আলোচনায় রত আছেন। ইংরাজির এম. এ. এবং বাঙলার অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আলাওলের "পদ্মাবতী" (১৯৬৮), মুহম্মদ কবীরের "মধুমালতী" (১৯৭১) ও "চর্যাপদ" সম্পাদনা করে এবং রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন-এর কবিতার উপর আলোচনা-পুস্তক লিখে তাঁর বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেন। The Bengali Press and Literary Writings (1818 31) গ্রন্থের জন্য ডক্টর আবু হেনা মোস্তাফা কামাল লনডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি ডিগ্রী পান। তাঁর অপর গ্রন্থ "কথা ও কবিতা" (১৯৮১)। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডকটর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং ইতিহাসের এম. এ. বদরুদ্দীন উমর বাঙলা সাহিত্যে মার্কসীয় সমাজ-

তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কয়েকখানি গবেষণাগ্রন্থ উপহার দিয়ে পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী "শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ" (১৯৭৮) "বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক" "উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ" এবং বদরুদ্দীন উমরের "পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" (৩ খণ্ড) এবং "বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বঙ্গসমাজ" এ-ধরনের গবেষণার ফল।

ষাটের দশকে এম.এ. পাশ করে যাঁরা অধ্যাপনা এবং গবেষণাকর্মে রত আছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর সৈয়দ আকরম হোসেন, ডকটর হুমায়ুন আজাদ, আহমদ কবীর, মনসুর মুসা, ডকটর লুৎফর রহমান, ডকটর রাজিয়া সুলতানা, ডকটর সাঈদ-উর রহমান, নরেন্দ্র বিশ্বাস, ডকটর রাজীব হুমায়ুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর আবদুল খালেক, ডকটর গোলাম মুরশিদ, ডকটর খন্দকার সিরাজুল হক, ডকটর মজিরুদ্দীন মিয়া, ডকটর আসাদুজ্জামান, ডকটর সারোয়ার জাহান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর মনিরুজ্জামান, ডকটর দেলোয়ার হোসেন, ডকটর লায়রুল বাশার, ডকটর ভূঁইয়া ইকবাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর আবুল কাশেম চৌধুরী, ডকটর হায়াৎ মামুদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সকলেই আগের দশকের গবেষণার ধারাকে লালন ও বহন করে চলেছেন, তাঁদের গবেষণার নির্দেশক ও পরামর্শদাতা হিসাবে পূর্বসূরীরা আছেন। তবে গবেষণার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্য এসেছে। তাঁরাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যের গবেষণার ধারক এবং বাহক। নীচের তালিকা থেকে এ-কালের গবেষণার ধারা এবং প্রবণতা বোঝা যাবে :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭২	ওয়াকিল আহমদ	বাংলার লোক-সংস্কৃতি
১৯৭৬	মঞ্জুশ্রী চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক
১৯৭৭	রফিকুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা
	আনোয়ারুল করীম	বাউলতত্ত্ব ও লালন শাহ
১৯৭৯	এম. এম. লুৎফর রহমান	বাউল সাধনা ও লালন শাহ
	নাজমা জেসমিন চৌধুরী	বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি
	সাঈদ-উর রহমান	পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা
১৯৮০	সৈয়দ আকরম হোসেন	রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ
১৯৮১	মোহাম্মদ বদিউজ্জামান	ইসমাইল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য
	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়	জসীমউদ্দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা
১৯৮২	খন্দকার রিয়াজুল হক	মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম
১৯৮৩	সারওয়ার জাহান	বঙ্কিম-উপন্যাসের সমালোচনার ধারা ও মূল্যায়ন
১৯৮৫	রাজিয়া সুলতানা	আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য
	এ. কে. এম. খায়রুল আলম (সিলেট)	দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৫	মুহম্মদ আবদুল খালেক মিয়া	মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদানের ব্যবহার
১৯৭৭	গোলাম মুরশিদ	উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজসংস্কারসচেনতার ইতিহাস এবং বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন
১৯৮৫	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান	রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্যশৈলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৯	জয়নাল আবেদীন	বাংলা প্রহসনের আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী সমাজ
১৯৮০	ওয়াকিল আহমদ	উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা
	মোহাম্মদ মজিরুদ্দীন মিয়া	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও সমাজ
১৯৮১	এ. কে. শামসুদ্দীন	মধুসূদনের মহাকাব্য
১৯৮২	দেলোয়ার হোসেন	বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার
১৯৮৩	খায়রুল বাশার	বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের অবদান (১৯৮৪)
১৯৮৫	ভুঁইয়া ইকবাল	পূর্ববাংলার উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-৭০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮২	আবুল কাশেম চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৮২০-৪৮)।

বিশ্বভারতী

১৯৮১	সনজীদা খাতুন	রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ

এঁদের মধ্যে মধ্য-বয়সের এবং উঠতি বয়সের গবেষক আছেন। তাঁরা এখনও গবেষণাকর্মে রত আছেন। তাঁরা মেধা এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে, এবং নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করে বাংলাদেশের সাহিত্যের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আমরা তা আশা করি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক যুগের সাহিত্য গবেষণার বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্তত চারটি সফল অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। সমাজে-শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে নজরুল ইসলাম জনপ্রিয় হলেও গবেষণায় সামান্য স্থান পেয়েছেন। অবশ্য সাধারণ মানের কিছু আলোচনা-পুস্তক আছে। সম্প্রতি নজরুল ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছে। এতে নজরুল-গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হতে পারে।

উপরের তালিকা থেকে এও লক্ষ করা যায় যে, গবেষকগণ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি দ্বারা গবেষণায় আগ্রহী বেশি। ভাবাবেগমুক্ত বস্তুবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায় এরূপটি সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি আমলের ভাবাদর্শ (ইডিয়লজি) এবং জাতীয়তা (ন্যাশনালিজম) পরিবর্তিত হওয়ায় চিন্তার রাজ্যে স্বাধীনতা তথা উদারতা এসেছে। গবেষণার মূল লক্ষ্য যে মুক্ত এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা, বাংলাদেশের নবীন গবেষকগণ সেদিকে এগুচ্ছেন, এটা খুবই আশাবাদের কথা।

১০-কোটি-বাঙালি-অধ্যুষিত এদেশে ৪০ বছরে প্রায় অর্ধশতক গবেষক এবং শতাধিক গবেষণাগ্রন্থ খুবই অপ্রতুল। মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অংশত

কলেজে অধ্যাপনার সাথে জড়িত থেকে একান্তভাবে পেশার কারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল এই গবেষণা। বাঙলা একাডেমীর বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা একটি লক্ষ্য হলেও এযাবৎ গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়া অধিক দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। বাংলাদেশের মানুষ কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভাষা, জাতীয়তা ও আত্মপরিচয় নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ করেছে। নতুন মেধার আকর্ষণ, পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি এবং গবেষকের উপযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাংলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণাকে অধিক উন্নত এবং সম্প্রসারিত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। এর সাথে দুই বঙ্গের পণ্ডিতগণের যোগসূত্র, মতবিনিময় ও সহযোগিতা যে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণার সম্ভাবনা বাড়াবে এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। এর জন্য ঢাকা-কলিকাতার যোগাযোগ সুগম হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক সমধর্মী গবেষণাকেন্দ্রের যেখানে দুই বঙ্গের গবেষকগণ সময়ে সময়ে মিলিত হতে পারবেন, মতামত বিনিময় করতে পারবেন, সেমিনারের সুযোগ পাবেন। এতে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা আছে, ভ্যাকুয়াম বা অপূর্ণতা আছে, তা দূরীভূত হবে।

আমাদের কলকাতা

অভিজিৎ চৌধুরী

ঘন-ঘন চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া অয়নের অভ্যাস। অবশ্য এই ফাঁকে যারা আয়নায় রূপচর্চা করে অয়ন তাদের দলে পড়ে না। বরং আয়না অয়নকে তার অভাবগুলির বিষয়ে সচেতন করে তোলে।

সোমবার ১৩ই জানুয়ারি বাথরুম থেকে অয়নের চোখে পড়ে বুবুনের বন্ধু পলটু ওর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আছে। এখান থেকেও চিবুকের কাটা দাগটা স্পষ্ট। বুবুন আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে অয়নের একটা অভেদ্য পাঁচিল রয়েছে। পলটুকে দেখে অয়ন অবাক হয়।

পলটু সৌজন্যপ্রকাশের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। একটু সময় নেয় অয়ন। কারণ, পুরো ব্যাপারটা, অর্থাৎ পলটুর অফিসে আসা আর সৌজন্যপ্রকাশ—নিজের ভূগোলের বাইরে মনে হয় অয়নের। পলটু সময় নষ্ট করে না, ডান কোমরে হাত রেখে ও বলে, 'অয়নদা, আপনার বাড়ি থেকে একটা জরুরি খবর আছে। বুবুন যে-কোনো মুহূর্তে স্ট্যাব্‌ড্‌ হতে পারে।'

পলটু দাঁড়ায় না। অবাক হয় না অয়ন। বুবুনদের লাশ না পড়লে ঐতিহ্যরক্ষা হয় না। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বোনদের আলাপে গুঞ্জন ছিল ছোড়দাকে নিয়ে। নিজের বাড়িতে নিজেকে প্রায়ই পরবাসী মনে হয় অয়নের। ছোটো বোন রীতাকে গত বছর ইডেনে পাড়ার কুখ্যাত ছেলে ভানুর সঙ্গে দেখে চমকে উঠেছিল। এখন রীতা প্রতি তিনমাসে প্রেমিক-বদল করে। ছেলেবেলায় অয়ন, বুবুন আর মা কিছুদিনের জন্য গিরিডি গিয়েছিল। বুবুন বরাবরই ডাকাবুকো। সেবার শম্ভুকাকুদের বাগানে আতা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বুবুন। চুরির ব্যাপারে অয়নেরও মদত ছিল, সে বিনা বিচারে খালাস পায়। পরদিন ভোরে মার সামনেই বুবুন ভুরু বেঁকিয়ে বলেছিল, 'ছুয়ো!' মুখে ব্রণ ওঠার পর থেকে অয়নের প্রতি বুবুনের তির্যক বিদ্রূপ আরো প্রখর হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর বেকার থাকার পর এই ইংরেজি সাপ্তাহিকে কাজ পেয়েও সংসারের সচ্ছলতায় কোনো বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে নি অয়ন।

একদিন খেতে বসে বুবুন বলেছিল, 'দাদা, তুই তো অনেককে চিনিস, বলে দেখ না…' অয়ন উত্তর দিতে পারে নি। বুবুন তখন ওর বন্ধু মোহনলালের গল্পটা বলে। মাসে-মাসে লেডি-স্টেনো বদলায়। বিড়ির ধোঁয়ায় দুঃখ উড়িয়ে দিতে-দিতে মোহন প্রায়ই খিস্তি ছড়ায়—'শালা কুত্তা!'

খোশবাহাদুর টেবিলে চিরকুট রেখে গেছে। এডিটর অমৃতেন্দুদা ডাকছেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে অয়ন। অমৃতেন্দুদা প্রিয় ভঙ্গিতে সোফায় বসে, পাশেই ডানদিকে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। গায়ের রঙে নীল সাগরের দেশের হাতছানি। অয়ন ভাবতে চেষ্টা করে অমৃতেন্দুদার তাকে ডেকে পাঠানো আর এই ভদ্রলোকের উপস্থিতির যোগসূত্রটা কী।

অমৃতেন্দুদা অবশ্য রহস্যের ওড়না সরাতে সময় নেন না: 'পরিচয় করিয়ে দি মি. ফাউলে—ইনিই মি. অয়ন সেন। আর অয়ন, উনি রবার্ট ফাউলে, তরুণ ইংরেজ কবি।' অমৃতেন্দুদা সংক্ষেপে ফাউলের ভূমিকা টানেন—ভালো বাঙলা জানেন। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতা আর ছোটোগল্পে গবেষণাধর্মী পড়াশোনা করেছেন। কলকাতা সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ। কলকাতা দেখার ব্যাপারে অয়নের সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রতিবাদে কিংবা সমবেদনায়, জলে আর আগুনে অয়ন কলকাতার আজন্ম প্রেমিক। প্রথম থেকেই ফাউলেকে ভালো লেগেছে অয়নের। মনে-মনে হিসেব করে এই তরুণ পাশ্চাত্ত্য কবিকে কোথায়-কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়।

স্মৃতিকাতর মানুষের প্রথম ভূমি ছেলেবেলা। অয়নের ছেলেবেলা মানেই কলেজ স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিট যাওয়ার আগে ব্রিগেড ঘুরে যেতে হবে। হালকা হাওয়ায় ভেসে আসা আমজাদের সরোদ—খোলা আকাশের নীচে জলসা, ফাউলে, তোমায় ওমর খৈয়ামের দেশে নিয়ে যাবে।

অমৃতেন্দু কফি অফার করে ওদের কলকাতা-ভ্রমণ সেলিব্রেট করতে চান। অয়ন রাজি হয় না। সেটা কফিহাউসে নির্ধারিত। ড. জনসনের ছোঁয়া-পাওয়া বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতায়ও আছে। অগুনতি টেবিলে ছড়িয়ে আছে গর্ঁগ্যা, ভ্যান গগ ইত্যাদি উদোম পাগল শিল্পীর দল অথবা এমিল জোলার মতো সাহিত্যিক। অয়নের ক্যানভাসে অমৃতেন্দুদাও ভুল স্রোতে বহু দূর ভেসে যান। কচি কলাপাতার চাদরে চশমার কাচ ঘষতে-ঘষতে বলেন, 'কফিহাউস! সে আমার যৌবন-বয়সের কথা। সত্তরের কলকাতা এখনও বুকে দামামা বাজায়।' ফাউলে একটু অবাক হয়। অকারণে মনে হয় ওর, কলকাতার সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। এই মানুষ দুটোও যেন ফসিল। কলকাতাকে ওরা তাই বর্তমানের ঘড়ির কাঁটায় ভুলে যায়। সামান্য পরিচয়ে অয়নকে মনে হয়, ও আবেগকে শৌখিন ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতে অভ্যস্ত। অমৃতেন্দু ভারতীয় মহাকাব্যের অন্ধ রাজা। তাই সত্তর দশক ওর কাছে রক্তাক্ত হলেও স্মৃতিমাত্র। সময়ের হঠকারিতা তুলনাহীন। হাজার মোলায়েমের ফাঁসি হলেও কলকাতার মানুষ রবিশংকরের সেতারে মনস্ক থাকবে।

যাই হোক, অমৃতেন্দুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফাউলে অয়নের সাথে বেরিয়ে পড়ে। ভিকটোরিয়ায় কয়েক চক্কর মেরে ওরা ব্রিগেডের মরা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। অয়ন জানায় ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা বসেছে। রাজ্যসরকার মেলা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার বই কিনছে, এতে গ্রামের অনগ্রসর গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ উপকৃত হবে। ফাউলে অয়নের কথার ফাঁকে-ফাঁকে নোট নেয়। অয়নের অস্বস্তি কিন্তু ফাউলের দৃষ্টি এড়ায় না। কিছু টীন-এজের দেহজীবিনী ফাউলেকে অকারণ লজ্জায় ফেলছে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই মেয়েদের দেহবিক্রি আইনদ্বারা অনুমোদিত বিনিময়। অনেক কবিশিল্পীর এরা প্রেরণাস্থল। তবে এক্ষেত্রে অয়নের উদ্দেশ্য ভিন্ন

ছিল—এমন অবস্থার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয় ছিল না। সন্ধ্যার বে-আবরু কলকাতায় আজন্ম কলকাতাপ্রেমিক অয়ন যেন নিজেকে ক্রমশ ফাউলের চেয়েও লজ্জিত আর অসহায় মনে করে।

হঠাৎ অয়নের মনে পড়ে ট্রামের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় দুপুর থেকে মধ্য আর উত্তর কলকাতায় যানবাহনব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কলেজ স্ট্রীটের বাস পাওয়া অসম্ভব। দ্বিধা সত্ত্বেও ফাউলেকে জানাতে হয় অয়নের। ফাউলে এবার আর নোট নেয় না। বাঁচে সুন্দরী কল্লোলিনী কলকাতা। বাঁচে তার প্রেমিক অয়ন সেন।

ওয়েলিংটনের মোড় ফেলে মেডিক্যাল কলেজকে বাঁয়ে রেখে ওরা যখন ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, অয়ন আবার নিজেকে ফিরে পায়। বইপাড়ায় প্রাণের অভাব নেই। অয়ন ফাউলেকে একে-একে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেনসি কলেজ, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ দেখায়। অয়ন যেন উচ্চারণ করে—ফাউলে, অনুভব করো প্রেসিডেনসির প্রতিটি ইটে রবার্টসনের শেকসপিয়র। ডেভিড হেয়ার নামছেন কোলে তাঁর অসুস্থ ছাত্র। সংস্কৃত কলেজ থেকে সাদা চাদরে খড়ম পায়ে চলেছেন বিদ্যাসাগর। ওই আমাদের গোলদিঘি, গাছের ছায়ায় প্রুফ দেখছেন অমরেশবাবু। জীবনবিজ্ঞানের নোট লেখেন—পাতায়-পাতায় সংরক্ষণ, অভিযোজন, ইকোসিসটেম, রক্তের গ্রুপ-বিভাজন এবং হিমোগ্লোবিনের রচনাভিত্তিক বিষয়মুখী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : কোনো-কিছুই বাদ পড়ে না। বিকেলের আলো ফুরিয়ে গেলে অমরেশবাবু তালতলার চিলতে ঘরে ফিরে যান, আর তখন লক্ষ করেন ছেলেটা প্রাকৃতিক অভিযোজনের বাইরে গিয়ে ফেরে নি। ইকোসিসটেমে নিজের অবস্থান ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে। মেয়েটার যে বয়সে লাবণ্য বাড়ার কথা সেই বয়সে রক্তের হিমোগ্লোবিন কমে সাদা ধবধবে হয়ে যায়।

'ফাউলে, তোমার দেশের টমাস হার্ডি বলেছিলেন, ওয়েসেক্স্‌ই তাঁর ইংল্যানড। আমরা কলকাতাবাসীরাও জানি, কলকাতার যে-কোনো প্রান্ত ভারতবর্ষের অতি বাস্তব ছবি। তবু কলকাতা কলকাতাই। অপ্রয়োজনীয় মনে করে যারা বিদ্যাসাগরকে স্কন্ধহীন করেছিল, তারাই আবার সঠিক আলোর পথ খুঁজে পেলে সৃষ্টির শিল্পে পিছপা হত না। কলকাতা তোমার মনের দরজা খুলে দেবে, ফাউলে, যদি গভীর হও। আগ্রহী তরুণ পাঠক কলেজ স্ট্রীটের পথেই নিজেকে খুঁজছে, ব্যর্থ কবির প্রথম কবিতার বই সমস্ত অনাগ্রহ তুচ্ছ করে কলকাতায় বেঁচে থাকে।'

ফাউলে অয়নের পিঠে হাত রাখে। ওকে দারুণ হাসিখুশি দেখায়। অয়নের ভাবনার রেশ ধরেই যেন ফাউলে বলে, 'অয়ন, কলকাতায় আসার আগে দিল্লিতে অনেকে ধ্বংসস্তূপের নগরীতে আসতে বারণ করেছিল। মধ্যপ্রদেশের স্থাপত্যশিল্পের মহার্ঘ্য এই বোহেমিয়ান কবির রুচিতে ঠাঁই পেল না। কলকাতাকে আমি আরো আরো দেখব, অয়ন। তোমাকেই বলি, বিগতযৌবনা এই সুন্দরীর সঙ্গে আমারও প্রেমপর্ব শুরু হয়েছে।' ফাউলে বুঝতে পারে সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। কলকাতার সমস্যার পাশাপাশি আবেগপ্রবণ মনের সহবাসও বোধহয় স্বাভাবিক।

কফিহাউসের নীচের তলায় সংবিতের সুস্থ নাটকের প্রচার "দুঃসময়ের মুখোমুখি"। উপরে উঠতেই পরিচিত গুঞ্জন। টেবিলে-টেবিলে ছড়ানো আড্ডা। কোনার দিকের টেবিলটা অয়ন বেছে নেয়—যেখানে প্রতি শনিবার বাঙলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয়দের বৈঠক বসে। দুটো কফির অর্ডার দিয়ে সপ্রতিভদের আড্ডায় স্থির লক্ষ্য রাখে ওরা। আড্ডার বিষয় এবং কেন্দ্রবিন্দু বিভিন্ন। পিছনের টেবিলে আলোচ্য মৃণাল সেনের "কলকাতা ৭১"। "নন্দন"-এ গত সপ্তাহে মৃণাল সেনের একগুচ্ছ নির্বাচিত ছবি দেখানো হয়েছে। অয়ন ঠিক করে ফাউলেকে কাল

নন্দনে নিয়ে যাবে। শিল্পের বিপন্ন পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক সহযোগিতা জানাবার অহংকার এখনও কলকাতা রাখে। যে মেয়েটি বিতর্কে বেশি উজ্জ্বল তার ভাষা ইংরেজি। আজকাল চীনের রাজধানীতে ইংরেজিতে বলতে পারার দারুণ কদর। কলকাতায় সেই রোগ তো দু শ বছরের বেশি পুরনো। ফাউলে, তুমি কি খুশি? মেকলের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলো কত সহজে আমাদের মাতৃভাষাকে সরিয়ে রাখতে পেরেছে।

ফাউলে বোধহয় অয়নের দুঃখের আগুন স্পর্শ করে। বিষণ্ণ দেখায় ওকে। মনোযোগী শ্রোতাদের একজনের হাতে হেডলির বেস্ট্‌সেলার। এমনও হতে পারে এরা কেউ-কেউ মাতৃভাষার সম্প্রসারণের পোসটারও মেরেছে। কলকাতা! সৃষ্টি আর বিনাশে এই দ্বন্দ্ব তোমার স্বাভাবিক।

কিন্তু যে দ্বন্দ্বের উৎসে আদর্শহীনতা, সমবেদনার ভূমিকায় অভিনয়ের অযোগ্যতা, সেই শহরের সভ্যতার একমাত্র ক্রমপরিণতি—ক্ষয়। কলকাতা, ফাউলে জেনেছে তোমার ক্যানসার হয়েছে। সাময়িক বাঁচিয়ে রাখার "রে" দিয়ে লাভ নেই। কলকাতা এইভাবে আরো কত কাল বেঁচে থাকবে কে জানে!

অয়নরা কফিহাউস থেকে ঠিক রাত নটায় মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে ফিরে আসে। বাসে ভিড়ের কমতি নেই। ওদের গন্তব্য উত্তর কলকাতার মানিকতলা। ফাউলে অয়নের সঙ্গে ওদের বাড়িতে রাত কাটাতে আগ্রহী। এতক্ষণে সকালে পলটুর দেওয়া খবরটা নিন্দের গল্পের মতন অয়নের সারা বুকে চেপে বসে।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট বেশ চওড়া। চওড়া রাস্তায় সদ্য-ছড়ানো খই দেখে সকালের খবরটা ঠিক ক্রশ-ওয়ার্ড পাজল মনে হয় না। মোড়ের পানের দোকানটাও বন্ধ। বুবুনদের কুখ্যাত ঠেক। সংক্ষিপ্ত পথটুকুও দুর্গম মনে হয় অয়নের।

ফাউলে কলকাতার নৈঃশব্দ্যে অবাক হয়েছে। বাড়ির দরজায় মা, রুমকি, নীতা বসে রয়েছে। কেউ কথা বলে না। রীতা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, অয়ন জোর করে ডেকে আনে। সহজ গলায় জিগ্যেস করে, 'বুবুন কোথায়?'

রীতা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'তোমার জন্য অনেক অপেক্ষা করে দেবুরা শ্মশানে গেছে।' 'টাকার দরকার?' সব ভুলে অয়ন সৌজন্য দেখায়। রীতা কঠিন গলায় উত্তর দেয়, 'না।'

তারপর ফাউলের হাত ধরে অয়ন নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। যন্ত্রণার বলিরেখাগুলি মুছে ফেলে সহজ হবার চেষ্টা করে। ফাউলের দিকে তাকিয়ে হাসে। আলো নিবিয়ে শব্দগুলোকে ঈথারে ছড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'মি. ফাউলে, এই আমার সাথে আমার ভাইয়ের, আর কলকাতার সাথে আমাদের সম্পর্ক।'

পরদিন রাত থাকতে ফাউলেকে ডেকে তোলে অয়ন। নেড়িকুত্তাগুলো জায়গায়-জায়গায় জটলা করছে। গুটিকয়েক বাড়িতে আলো জ্বলছে। টুংটাং চায়ের বাসনের শব্দ ভেসে আসছে। বিবেকানন্দ রোড পড়তেই কুয়াশা ভেঙে ভোরের আলো পরতে-পরতে নতুন রঙ ছড়িয়ে দিল। একটু পরে ডালহাউসির ট্রাম আসবে। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ফাউলের হাতনাড়া কখন স্মৃতি হয়ে যাবে। ফাউলে জানবেও না, এই ট্রামে-চাপা-পড়া এক মগ্নকবি স্বপ্ন দেখেছিলেন কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। যন্ত্রণায় বঞ্চনায় একাকিত্বে সেই কলকাতায় কত অন্ধকার এখন।

হিংসার বদলে

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(অকটোবর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুস্মৃতি)

কিছু-কিছু নিয়মশৃঙ্খলা আইনকানুন মেনে চলতে হয়, জনমতেরও খানিকটা তোয়াক্কা রাখতে হয়, ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রশক্তি সন্ত্রাসবাদের দমনে "ইটের বদলে পাটকেল" নীতি, যেখানে সম্ভব, পরিহার করতেই চায়, কিংবা পরিহার করতে বাধ্য হয়। অবশ্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনেক কিছুই করা চলে নানারকম গুপ্ত সংস্থার সাহায্যে, কিন্তু, অনিয়ন্ত্রিত আলোক-সম্পাত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে সরকারি গোপনীয়তার প্রচেষ্টাকে অনবরত পর্যুদস্ত করে চলেছে। আইনকানুন ইত্যাদির বাধা অল্পবিস্তর থেকে যায়, কিন্তু সরকার যদি সে বাধাকে বাধা বলে জ্ঞান না করে, তাহলে সন্ত্রাসবাসকে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় কলকাতার "সানডে" সাপ্তাহিকের ২১—২৭ সেপটেমবর সংখ্যায় এক প্রবন্ধে। সুপরিচিত সাংবাদিক তুষার পণ্ডিত তাঁর "ক্যান টেররিস্‌ট্‌স্ বী ডিফিটেড?" প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা থেকে জানা যায়, সেপটেমবর ১৯৮৫-তে লেবাননে মুসলিম মৌলবাদী উগ্রপন্থীরা যখন চারজন রুশ কূটনীতিককে বন্দী করে এবং তাঁদের একজনকে হত্যা করে, তখন সোভিয়েত সরকার কোনোরকম আলাপ-আলোচনার ধার দিয়েও গেল না। তারা কী করল? সিরিয়ার গুপ্তচর সংস্থার সহযোগিতায় রুশ কেজিবি উক্ত উগ্রপন্থীদের সহ-যোগী বলে যাদের সন্দেহ করা যায়, এমন দশজন ব্যক্তিকে, সাদা বাঙলায় বলতে গেলে, নিয়ে গেল। তারপর সেই দশজনের মধ্যে যে প্রধান তাকে খুন করে, এবং খণ্ড-খণ্ড করে, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নেতার কাছে পাঠানো হতে লাগল—এক-এক খণ্ড এক-এক বারে। তারপর আর সেই তিন রুশ বন্দীর বেইরুটে সোভিয়েত দূতাবাসে ফিরে আসতে দেরি হয় নি। একটি ইংরেজি গীতিনাট্যের একখানি গান কিছুকাল আগে লোকের মুখে-মুখে ফিরত—"এনিথিং ইয়ু ক্যান ডু, আই ক্যান ডু বেটার।"

ওই "সানডে" সাপ্তাহিকেরই ঠিক আগের

সংখ্যাটিতে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মাইকেল এর্ডো-য়ার্ডসের সদ্যঃপ্রকাশিত একটি বই "দ্য মীথ অব দ্য মহাত্মা" থেকে কিছু-কিছু অংশ ছাপা হয়েছে। তাতে লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, গান্ধীকে ভয় করবার কোনো কারণ আছে বলে ব্রিটিশরা মনে করত না। আইন অমান্য আন্দোলন অহিংস থাকলে তাদের ভাবনার বিশেষ কিছু নেই। সেই আন্দোলনে ক্ষতি কাদের? শুধু ভারতীয়দেরই। এখানে-ওখানে ছোটোখাটো দু-একটা হিংসাত্মক ঘটনা দমন করবার শক্তি সরকারের ছিল। কিন্তু একবার যদি কংগ্রেসের ওপর থেকে গান্ধীর আধিপত্য চলে যেত, তখন তাঁর তৈরি সংগঠন ব্যবহার করতে পারতেন সেইসব লোকেরা যাঁরা অধিকতর গতিশীল ছিলেন এবং যাঁরা অহিংস ছিলেন না। ব্যাপক আকারের (সশস্ত্র) অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হত না। মাইকেল এডোয়ার্ডসের মতে, সেই কারণেই সরকার গান্ধীকে মাঝে-মাঝে লোকদেখানো কারাদণ্ড দিত, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সক্রিয় হয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে, এবং পাশ্চাত্ত্য রীতির বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, যাদেরকে সরকার সত্যি-সত্যি ভয় করত।

কিছু ঘটনা, কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা, কিছু অনুমান, কিছু জল্পনাকল্পনা, এক ধরনের আধুনিক সাংবাদিকতা-ধর্মী লেখার এই সবই এমনভাবে জট পাকিয়ে যায় যে ঘটনাটাকে সত্য বলে স্বীকার করতে গিয়ে দেখা যায়, লেখকের নিজস্ব মতামত, নিজস্ব ব্যাখ্যা, এবং নিজস্ব জল্পনাকল্পনা আর অনুমান সবই যেন একই রকম স্বীকৃতি দাবি করছে, প্রশ্নের আর সন্দেহের ঊর্ধ্বে আসন চাইছে।

তখনকার ভারত সরকার গান্ধীকে জেলে দিয়েই ক্ষান্ত থাকত; উৎপীড়ন, দৈহিক নির্যাতন তাঁর ওপর করে নি—এ অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু সে কি অহিংস আন্দোলনকে এবং তার নেতাকে ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না, সেই জন্যে, না অন্য কারণে—তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। এমন-কি, মাইকেল এডোয়ার্ডস যা বলেছেন তার উলটোটাই সত্য, গান্ধীকে ভয় করবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই সরকার তাঁকে ফাঁসি দেয় নি, জেলখানায় তাঁর ওপর নির্যাতন করে নি, করতে সাহস পায় নি—এমন একটা ব্যাখ্যাও সম্ভব। ফাঁসি না গেলেও, দ্বীপান্তরে না গেলেও, অহিংস-আন্দোলনকারীরা অনেকে যে নির্যাতন ভোগ করতেন, সে কথা আমাদের সকলেরই জানা। একটি চোখ হারিয়ে অতুল্য ঘোষ সেদিন পর্যন্ত তার জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন। আমরা এও জানি, আদালতের হুকুম ছাড়াই সরকার কখনো-কখনো অহিংস সৈনিকের প্রাণনাশের প্রয়োজনও বোধ করত। মাতঙ্গিনী হাজরাকে সরকারের ভয় করবার কারণ ছিল, গান্ধীকে ভয় করবার কারণ ছিল না—এ কথা কি বিশ্বাস করবার?

তবে, একথা ঠিক, আদালতের বিচারে ফাঁসি এবং দ্বীপান্তর সন্ত্রাস-সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্যেই বরাদ্দ ছিল। তা ছাড়া, সন্ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্রের উদ্‌-ঘাটনের প্রয়োজনে, কিংবা সেই অজুহাতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপরে দৈহিক নির্যাতনও কম হয় নি। তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে খুব বেশি দূর যেতে হয় না—আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে মৃত্যুর আশঙ্কা পুলিস এবং প্রশাসনের ওপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য। পুলিস-হাজতে বন্দীকে যদি তারই ফল ভোগ করতে হয়ে থাকে, পছন্দ করি বা না করি, সেটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মানতে হয়। সন্ত্রাস যত রকম ভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, নির্বিচার অন্ধ হিংস্রতা তার মধ্যে একটি।

কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হল, স্বাধীন দেশের নিজের সরকারই হোক, আর পরাধীন দেশের পরের সরকারই হোক, শাসন চালাতে গেলে তাকে আইনের আশ্রয় নিতেই হয়, এবং আইন যে ভাঙবে তাকে সাজা দিতেই হয়। এবং তার মধ্যে কিছু-কিছু আইন থাকে যাকে বলা যায় দেশশাসনের পক্ষে অপরিহার্য। পরাধীন ভারতে সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমনের

জন্যে, সন্ত্রাসবাদী হত্যা নিবারণের জন্যে আইনের প্রয়োগ করতে হত; নয়তো দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন তখনি তুলে নিয়ে যেতে হত। এ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পন্থা ছিল না। হত্যা, হত্যার চেষ্টা এবং হত্যার যড়যন্ত্রের সম্পর্কে সাধারণ আইন যেমন এখন আছে, তখনও ছিল। কাজেই, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়কদের এবং রাজনৈতিক হত্যা মামলার অভিযুক্তদের যে দণ্ড দেওয়া হত, গান্ধীকে কেন সে দণ্ড দেওয়া হয় নি, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার জন্যে, ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারত সরকার গান্ধীকে কতটা ভয় করত, আর বোমাপিস্তলধারী স্বাধীনতাপ্রয়াসীদের কতটা ভয় করত—তার তুলনামূলক বিচার না করলেও চলে। সে উত্তর স্বাধীন ভারতের দণ্ডবিধির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নদাশংকর রায় তাঁর স্মৃতিকথা "আই সি এস"-এ বলেছেন: 'আমাদের সার্ভিসে যেসব ইংরেজ যোগ দিতেন তাঁরা উৎকট সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তবে একটা জায়গায় তাঁরা দৃঢ় ছিলেন। বিপ্লববাদ বা সত্যাগ্রহ তাঁরা বরদাস্ত করতেন না। রুল অব ল বজায় রাখতেই হবে এ বিষয়ে সব ইংরেজ একমত।' যে আইনের শাসন বজায় রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন সে আইন অহিংস আন্দোলন আর হিংসাত্মক সংগ্রামকে সমদৃষ্টিতে দেখে নি, বলাই বাহুল্য। তখনকার আইনও দেখে নি, এখনকার আইনও দেখে না। কোনো দেশেরই আইন দেখে বলে আমাদের জানা নেই। হিংসার প্রত্যুত্তরে প্রবলতর হিংসা—এই ভাষাতেই সমাজ এবং রাষ্ট্র চিরকাল কথা বলে এসেছে।

গান্ধীর ভাষা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা; তাঁর বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজকে তিনি অবশ্যই বলেছিলেন ভারত ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু শুধু ওইটুকুই যদি তাঁর বক্তব্য হত, ইংরেজ তার উত্তর দিতে পারত সংক্ষেপে: 'না, যাব না। অন্তত তোমার কথায় যাব না।' কিংবা আরেকটু বিস্তারিত করে বলতে পারত: 'তুমি আমাদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলবার কে? ভারতের কোটি-কোটি মানুষ এখনও চায় আমরা এদেশ শাসন করি, আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের পুলিস, আমাদের আইন তাদের অরাজকতা থেকে, মাৎস্যন্যায় থেকে রক্ষা করুক।' উত্তরে গান্ধীও যদি বিস্তারিত করে বলতেন: 'যদি ভারত না ছাড়, গায়ের জোরে ছাড়াব, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আঘাতে দেশছাড়া করব তোমায়। ভালো চাও তো মানে-মানে আগেই সরে পড়ো।' ইংরেজের তরফে তার একমাত্র উত্তর হতে পারত: 'বটে! ভয়ে পালাব? আমাকে তেমন কাপুরুষ পাও নি। ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে।'

গান্ধী যদি অহিংসায় বিশ্বাসী না হতেন, যদি হিংসাত্মক আন্দোলনের ডাক দিতেন দেশবাসীকে, অর্থাৎ গান্ধী যদি গান্ধী না হয়ে অন্য কেউ হতেন, কিংবা দেশবাসী যদি তাঁকে খারিজ করে হিংসার পন্থায় বিশ্বাসী কোনো নেতাকে তাঁর জায়গায় বসাত, তা হলে আমাদের স্বাধীনতা ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্টের আগেই আসত কিনা, কিংবা দেশ অখণ্ড থেকেই স্বাধীন হত, না, আরও টুকরো-টুকরো হয়ে যেত—এসব প্রশ্নের মীমাংসা এক কথায় হবার নয়। কী হলে কী হত, সেই ভাবনার কল্পলোক ছেড়ে বাস্তব ঘটনার মর্ত্যভূমিতে নেমে এসে দেখতে পাই—গান্ধী অহিংস সত্যাগ্রহী, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের, হিংসাত্মক আন্দোলনের ভয় দেখান নি ব্রিটিশ রাজকে, বরং বলেছেন: 'অহিংসার প্রকৃত অর্থ, কাউকে তুমি আঘাত করতে পার না; যাকে তুমি শত্রু মনে কর, তার সম্পর্কেও কোন বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতে পার না।' (ওয়াই এম সি এ-তে প্রদত্ত ভাষণ, ১৬ ফেবরুয়ারি, ১৯১৬)। ১৯৩০-এর আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যে যে আচরণবিধি গান্ধী বেঁধে দিয়েছিলেন, তাতে এই নীতিটাই কঠিন অবয়ব পেয়েছিল: তাতে ছিল প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত করবে না; তাকে অপমান করবে না; অপমান এবং আঘাত থেকে তাকে, এমন-কি নিজের প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে।

তা হলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের "প্রতিপক্ষ", অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশে গান্ধীর বক্তব্যটা কী দাঁড়াল? তোমার ওপর রাগ করব না, তোমায় কোনোরকম আঘাত কি অপমান তো করবই না, বরং আঘাত এবং অপমান থেকে তোমায় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। তবু তোমায় ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন?

এই "কেন"-র উত্তর গান্ধী সারা জীবন ধরে দিয়ে গেছেন। ১৯৪২-এর ৮ই অগস্ট অল-ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গান্ধী তাঁর ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় আরেক বার সে উত্তর দিলেন:

> যে মুহূর্তে দাস মনে করল সে স্বাধীন জীব, সেই মুহূর্তে তার দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন হল। সে তার প্রভুকে সোজাসুজি বলবে, 'এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোমার দাস ছিলাম, কিন্তু এখন আমি আর দাস নই।'

অর্থাৎ, ভারতবাসী যদি মনে করে সে ইংরেজের দাস নয়, তখন আর দাসত্বের বন্ধনে সে বাঁধা থাকে না। তখন ইংরেজের সামনে দুটিমাত্র পথ খোলা থাকে—হয় ভারত ছাড়তে হয়, নয়তো অস্ত্রশক্তির সাহায্যে ভারতবাসীর আনুগত্যলাভের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সত্যাগ্রহ সেই বন্ধনমোচনের ঘোষণা। ১৯০১-এ প্রকাশিত "হিন্দ্ স্বরাজ অর ইনডিয়ান হোম রুল"-শীর্ষক ইশতাহারে ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশে গান্ধী বলেন:

> যদি চাও আমাদের টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলতে পার, কামানের মুখে উড়িয়ে দিতে পার। আমাদের ইচ্ছার যদি বিরুদ্ধাচরণ কর, আমরা তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব না, এবং আমাদের সহযোগিতা ছাড়া তোমরা এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, তা জান।

এই বার্তা একদিকে ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশে উচ্চারিত, আরেক দিকে তেমনি ভারতবাসীর উদ্দেশেও বটে। "প্রাণ দেবে, তবু যা অন্যায় বলে জেনেছ তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।" অসহযোগ আন্দোলন যে কয়েকটি মৌল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তার একটি হল—শাসকের যে ক্ষমতা, যে কর্তৃক তা সম্পূর্ণরূপে শাসিতের আজ্ঞানুবর্তিতার ওপর নির্ভরশীল। এবং, শাসকের শাসন করবার অধিকার, আজ্ঞাদানের অধিকার শাসিত যদি স্বীকার করে না নেয়, যে কর্তৃত্ব অর্থাৎ অথরিটি শাসকের ক্ষমতার উৎস, সেইটাই তখন দেখা যায় নিরালম্ব। গান্ধী বলেছেন, 'আমাদের পরাধীনতার জন্যে ব্রিটিশদের বন্দুক ততটা দায়ী নয় যতটা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা।' বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, এবং প্রত্যেকে একথা মানতে বাধ্য, কোনো সরকার এক মুহূর্তও টিকতে পারে না জনগণের সহযোগিতা ছাড়া, সে সহযোগিতা স্বেচ্ছাকৃতই হোক, আর জোর করেই আদায় করা হয়ে থাক; এবং লোকে যদি হঠাৎ সর্বৈবভাবে সে সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নেয়, সরকার অচল হয়ে যাবে।' (ইয়ং ইনডিয়া, ১৮ই অগস্ট, ১৯২০)

ব্রিটিশ রাজকে গান্ধী বলেছিলেন, এদেশে তোমার শাসন ঘোর অন্যায়। দেশবাসীকে বলেছিলেন, 'এই যে শাসন, চতুর্বিধভাবে যা দেশের সর্বনাশ করেছে, তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা মানুষ এবং ভগবানের দৃষ্টিতে অন্যায়। কার গায়ে জোর বেশি, কার গায়ে কম—এখানে প্রশ্নটা তা নয়। আমি বলছি, আমি এত কোটি লোকের নেতা, আমি তোমার চেয়ে দলে ভারি, আমার কথা তুমি শুনতে বাধ্য—কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে, তুমি যা করছ তা তোমার পক্ষে অনুচিত, তা সহ্য করা আমার পক্ষে অনুচিত, অতএব তোমার কর্তব্য সে কাজে বিরত হওয়া, আমার কর্তব্য তোমাকে তাতে নিরস্ত করা। নিরস্ত করবার উপায় কী? অসহযোগ। সত্যাগ্রহ। কিন্তু তার আগে প্রতিপক্ষকে নিজের কথা বুঝিয়ে বলার, তাকে নিজের ভুল বুঝবার সুযোগ দেবার, তার শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানোর কাজটাও

অবশ্যকরণীয়। সত্যাগ্রহী প্রথম থেকেই ধরে নেবে না—বিবেক, বিচারবোধ, নৈতিক চেতনা আমারই আছে, প্রতিপক্ষের নেই। মানুষ রাজনৈতিক জীব, এবং সে কথা বলে থাকে। মানুষের এই দুটি সংজ্ঞা আলাদা করা যায় না। কথোপকথন ছাড়া রাজনীতি অসম্ভব। কিন্তু হিংসার প্রবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে কথোপকথনের অবসান। সে হিসেবে হিংসা রাজনীতির বহির্ভূত। হিংসাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে অহিংস সত্যাগ্রহর এইখানেই মূল প্রভেদ। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আগে, আন্দোলনের সময়ে এবং আন্দোলনের শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথোপকথনের দরজা সব সময় খোলা থাকে। সে দরজা খুলে রাখতে হয় এই কারণে যে, প্রতিপক্ষেরও যুক্তি থাকতে পারে, "সত্য" তার দিকেও থাকতে পারে, এ সম্ভাবনা সত্যাগ্রহী অগ্রাহ্য করতে পারে না।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, কথোপকথন, যুক্তির সাহায্যে তার ভ্রান্তিমোচনের প্রচেষ্টারই আরেক নাম সত্যাগ্রহ। আসলে, সেসব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, অন্তত তখনকার মতো ব্যর্থ হল, যখন দেখা গেল প্রতিপক্ষ তার অন্যায়টাকে পশুশক্তির সাহায্যে অনড় করে রাখতে বদ্ধপরিকর, তখন সত্যাগ্রহীর সামনে যে রাস্তাটা খোলা থাকে, সেটা সংগ্রামেরই রাস্তা। গান্ধীও ব্রিটিশ যাতে ভারতশাসনের ভ্রান্তপথ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে সে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তা যে হবার নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর, ১৯৩০-৩১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনি ভাইসরয়কে লিখেছিলেন:

> যুক্তির সাহায্যে বিশ্বাস উৎপাদন করা নয়, শক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত শক্তির প্রয়োগ করতে হবে, এখন তাই দেখা যাচ্ছে। আমাদের বক্তব্য স্বীকার করুক আর না করুক, গ্রেট ব্রিটেন সর্বশক্তি দিয়ে ভারতে তার ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং স্বার্থরক্ষা করবেই। অতএব সেই মৃত্যুর অতএব সেই মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য যথেষ্ট শক্তি ভারতকে অর্জন করতে হবে।

একমাত্র অহিংস সত্যাগ্রহই যে সে শক্তি ভারতকে জোগাতে পারে, সে বিষয়ে গান্ধী স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। এ বিশ্বাস কি ভ্রান্ত ছিল? অহিংস সত্যাগ্রহ কি মানুষকে শক্তি দেয়, না দুর্বল করে?

অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয় নি। হিংসাত্মক আন্দোলন সম্পর্কেও একই কথা খাটে, তার সাফল্যও যে অবধারিত, ইতিহাস সে কথা বলে না। কাজেই, অহিংস সত্যাগ্রহ পন্থা হিসেবে বর্জনীয়, এ কথা প্রমাণ করতে গেলে, কোথায়-কোথায় তা ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করেছে, সে দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নয়। যে দুর্বল, অসহায় মনে করত নিজেকে, যার নিজের ওপর, নিজের শক্তির ওপর আস্থা ছিল না, যে মনে করত, প্রবলের সামনে, তাকে অন্যায়কারী জেনেও নতজানু হওয়া ছাড়া নিজের আর গত্যন্তর নেই, নিজের মর্যাদার যে মূল্য দেয় না, তাকে যদি বল না যোগায়, ভরসা না নেয়, আত্মশক্তিতে তাকে আস্থা না দেয়, অন্যায়ের সামনে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে না শেখায়, নিজেকে মর্যাদা দিতে না শেখায়, তা হলে অহিংস সত্যাগ্রহ ব্যর্থ।

একটি দৃষ্টান্তের দিকে তাকানো যাক। "কংকোয়েস্ট্ অব ভায়লেনস্" নামক অতি বিখ্যাত গ্রন্থে জোন ভি. বনডিউরান্ট্ পাঁচটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এটি তার একটি: ১৯২৮-র বিখ্যাত বারদৌলি আন্দোলন। (কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কিছু-কিছু উদ্ধৃতি এবং তথ্য উক্ত গ্রন্থ থেকে এবং জীন শার্প-এর "দ পলিটিকস অব নন-ভায়লেন্ট অ্যাকশন" নামক অমূল্য বই থেকে গৃহীত)।

তখন বোমবাই প্রেসিডেনসির অন্তর্ভুক্ত, এখন গুজরাতের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকের কৃষকেরা ১৯২৮-এর ১২ই ফেবরুয়ারি থেকে ৪ঠা অগস্ট পর্যন্ত যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন, সত্যাগ্রহর ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। বোমবাই সরকারের রাজস্ব বিভাগ ১৯২৭ সালে বারদৌলি তালুকের ভূমিরাজস্ব নতুন করে যা নির্ণয় করেন, তাতে কাগজে কলমে দেয় রাজস্ব শতকরা ২২ ভাগ বাড়লেও, কোথাও তা বেড়ে যায় শতকরা ৬০ ভাগ। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল: বৃদ্ধির হার অযৌক্তিক, যথেষ্ট তদন্ত না করেই বর্ধিত হার নির্ধারিত হয়েছে, বৃদ্ধি অনুচিত।

যদিও একটি স্থানীয় অবিচারের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন, গান্ধী এর বৃহত্তর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 'যা কিছু তাদের সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের শক্তি জোগাবে এবং সম্মিলিতভাবে দুঃখভোগে তাদের অভ্যস্ত করবে, তাই আমাদেরকে স্বরাজের আরও কাছে নিয়ে যাবে।'

এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গঠনকর্মে গান্ধীর দুইসঙ্গী। জেলার বাইরে থেকেও দুজন পারসি মহিলা এসেছিলেন, বোমবাই থেকে। আন্দোলন শুরু হবার ছ মাস পরে গান্ধী এসে সরদার প্যাটেলের নেতৃত্বের অধীনে আন্দোলনে যোগ দেন, যদিও তার আগেই "ইয়ং ইনডিয়া"-তে আন্দোলনের সমর্থনে তিনি লিখছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন প্রায় ২৫০ জন। কয়েক হাজার আদিবাসী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মহিলারা ছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বারদৌলি তালুকের (জনসংখ্যা ৮৭০০০) অধিকাংশ লোক এই আন্দোলনে শামিল হন, প্রথম দিকে মহাজন, গ্রামের মোড়ল, ছোটোখাটো সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি অনেকে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদেরও অনেকে আন্দোলনে যোগ দেন। সরকারি কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে দেন।

প্রতিপক্ষ বোমবাই সরকার জেলার পুলিসকে জোরদার করবার জন্য উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পাঠান-বাহিনী আমদানি করে। বোমবাইয়ের গভরনর বলেন, প্রশ্নটা হল, 'ভারত-সম্রাটের আজ্ঞা এখানে, তাঁর রাজত্বে, পালিত হবে, না কি একদল বেসরকারি ব্যক্তির হুকুম পালন করতে হবে? এই প্রশ্নে গভরনমেনট তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে প্রস্তুত।'

অর্থাৎ সরকার পক্ষ প্রস্তুত সম্মুখসমরের জন্যে। কিন্তু অহিংস সংগ্রাম ঘোষণার আগে, সত্যাগ্রহীর নীতি অনুযায়ী, সরকার যাতে তার ভ্রান্ত পথ পরিহার করে তার জন্য চেষ্টা প্রচুর হয়েছিল। স্থানীয় কংগ্রেস একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে দেখিয়েছিল, কৃষকদের বর্ধিত কর দেবার ক্ষমতা নেই। প্রদেশ সরকারের রাজস্ব-সদস্যের সঙ্গে কংগ্রেসের একটি কমিটি দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানান। প্যাটেল গভরনমেনটের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। যখন গভরনমেনট শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেয়, কোনোরকম বিবেচনা করতে তারা প্রস্তুত নয়, তখন এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সরকার যতদিন পর্যন্ত পুরনো হারে কর গ্রহণ করতে রাজি না হবে, অথবা যতদিন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ কমিশন নিযুক্ত না হবে, ততদিন কৃষকেরা কর দেবে না।

তারপর আরম্ভ হল অসহযোগ। রাজস্ব-সংগ্রাহকরা রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে দেখে, বাড়ির দরজা বন্ধ, কিংবা দরজা যদি বা খোলা হল গৃহকর্তা রাজস্ব দেওয়ার বদলে সরদার প্যাটেলের বক্তৃতার অংশ পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। জোর করে পুলিস এনে যখন দরজা ভাঙা হল, দেখা গেল, কৃষকের সরঞ্জামাদি সেখানে নেই, কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মহিলারা স্বেচ্ছাসেবিকারা সরকারের দখল করা জমির ওপর ঘর বেঁধে বাস করতে লাগলেন, কৃষকেরা সেখানে বীজ বুনেই চললেন।

সরকার আন্দোলন দমনের জন্যে জমি দখল করতে আরম্ভ করল, যেখানে পারল অস্থাবর সম্পত্তি, বাসনপত্র, খাট, মোষ, মোষের গাড়ি কেড়ে নিয়ে গেল। পুলিস যথারীতি বলপ্রয়োগ শুরু করল। তা ছাড়া আরও নানাবিধ চেষ্টা চলতে লাগল আন্দোলন ভেঙে দেবার। দলে-দলে লোক গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের জায়গায় নতুন লোক এলেন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে।

জুলাই মাসে প্যাটেলকে আমন্ত্রণ জানানো হল, গভরনরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে। গভরনমেন্ট বলল তদন্তে রাজি আছি, কিন্তু তার আগে কর পুরোপুরি দিয়ে দিতে হবে। সে তদন্ত করবেন একজন রাজস্ব অফিসার, তবে তাঁর সঙ্গে একজন বিচার-বিভাগীয় অফিসার থাকতে পারেন।

প্যাটেল বললেন, সরকারি তদন্ত হতে পারে, কিন্তু সেটা বিচারবিভাগীয় হওয়া চাই, এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য দেবার জন্যে ডাকতে হবে। এবং, সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্রের বাজার-মূল্য দিতে হবে, সমস্ত বরখাস্তের আদেশ রদ করতে হবে।

৪ঠা অগস্ট যে মীমাংসা হল তাতে সত্যাগ্রহীদের মূল দাবি সবই মেনে নেওয়া হল, অথচ গভরনমেনটেরও মুখ-রক্ষা হল।

তদন্তের জন্য ক্রমফিল্ড কমিটি গঠিত হল, বাজেয়াপ্ত জমি মালিকেরা ফেরত পেলেন, সত্যাগ্রহীরা মুক্ত হলেন, এবং নতুন করে কর নির্ধারিত হল। বারদৌলিতে রাজস্বের হার কার্যত আগেকার মতোই থাকল।

বারদৌলির সত্যাগ্রহ সফল হয়েছিল, কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাফল্য অবধারিত, এমন দাবি কেউ করে না। হিংসাত্মক আন্দোলন যেমন বিফল হতে পারে নানা কারণে, যথা আন্দোলনকারীদের কোনো ভুল বা দুর্বলতার কারণে, যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে, অহিংস আন্দোলনও তাই। হিংসাত্মক আন্দোলনে যেমন আন্দোলনকারীকে আঘাত, দুঃখ-ভোগ এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা স্বীকার করে নিতে হয়, অহিংস আন্দোলনেও তাই। প্রভেদের মধ্যে, অহিংস আন্দোলন কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যে পন্থাটি বেছে নেয় সেটাও নৈতিক শক্তির আধারের ওপর স্থাপিত, ভালো লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে ভালো পথটাই উপযুক্ত বলে সে মনে করে।

পন্থার যে কালিমা তা লক্ষ্যকেও কালিমালিপ্ত করে, এ শিক্ষা মানুষ কবে গ্রহণ করবে কে জানে।

সংশোধন

অগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সুলতানা কামালের প্রবন্ধে ২৫৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের নবম লাইনে উল্লিখিত 'নারী সংহতি' সংস্থাটির যথার্থ নাম 'নারীমুক্তি আন্দোলন'।

কবিতার জগৎ ভালোবাসার জগৎ

অফুরন্ত জীবনের মিছিল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩। প্রচ্ছদ খালেদ চৌধুরী। দশ টাকা

"One short sleep past, we wake eternally
And death shall be no more, death thou shall die."
—John Donne

মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে আমাদের বিশ্বাস কমে গেছে; আত্মা অবিনশ্বর, এই শাস্ত্রীয় বাক্যের ওপর সে নির্ভরতা নেই, তাই মৃত্যুকেই সবকিছুর শেষ মেনে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে আমরা বদ্ধপরিকর—এই লড়াইয়ে কেউ জেতে, কেউ হারে—প্রথমাবধি লড়াই চলছে। যাঁরা ঘাট পার করে দিয়েছেন তাঁরা এই ভেবে খুশি যে মৃত্যুকে এতদিন ধরে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন, কিন্তু ঘাটের পর? ঘাটের পর মৃত্যুর হানা যে-কোনো সময় প্রত্যাশিত—বিশেষ করে মৃত্যু যখন একটি কোণ ঘেঁষে তার উপস্থিতি ঘোষণা করতে থাকে। প্রশ্ন, তখন কি মৃত্যুচিন্তা ছাড়া মানুষের মনে আর কোনো চিন্তা থাকে? বোধহয়, একজন সংকবির মনে আরও এক চিন্তা থাকে; তাঁর মনে এই মৃত্যু কেবল নিজের জীবনের অবসান এবং নিজের প্রতিষ্ঠার অবলুপ্তির ছায়া ফেলে না, তাঁর কাছে মৃত্যু মানে এক নির্মীয়মাণ ভালোবাসার জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া—যে ভালোবাসার জগৎ তিনি তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন—সেই জগৎকেও ছেড়ে চলে যেতে হবে—।

তাই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে (ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হসপিটালে) কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন এবং ভাবছেন, কেন অনেক কনিষ্ঠ কবি লিখতে-লিখতে লেখা বন্ধ করে দিলেন, এঁদের অনেকেই চাকরি-বাকরি এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন হয়তো কিন্তু কবিতা লেখা বন্ধ করলেন কেন? নিজের লেখা যখন বন্ধ হয়ে আসছে, তখন এরকম ভাবনা খুবই সংগত—কবিতার প্রতি ভালোবাসার জন্যই এরকম ভাবনা—কেননা কবিতা দিয়েই তিনি চেয়েছিলেন এই ভালোবাসার পৃথিবী গড়তে। রোগশয্যায় শুয়ে তিনি না-

গ্রন্থসমালোচনা

লেখা কবিতাগুলির কথা ভাবছেন, কবিদের কথাও ভাবছেন:

কিন্তু কোথাও একটা অভাববোধ থেকেই যায় / আর সেখানেই তোমার জন্য আমার ভাবনা (অসীমের জন্য কয়েক লাইন, পৃ ৯)

নিজে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ভাবছেন অরুণ ভট্টাচার্যের কথা—

এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হও / আমরা তোমার আরোগ্য কামনা করছি / তুমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠো আবার / কবিতা লেখো।

কবিতা যে কেবল মানুষে-মানুষে মেলবন্ধনের একমাত্র ভাষা, কেবল তাই নয়। কবিতা একদিকে যেমন তাঁর প্রাণবায়ু—প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস, ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো স্বাভাবিক তেমনি তাঁর যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে কবিতার ওপর কোনোদিন তিনি বিশ্বাস হারান নি—কারণ তা হত তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস-হারানোর মতো।

কবিতা বিপ্লবের পক্ষে এক শানিত অস্ত্র—পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে তিনি কবিতাকেই এই অমোঘ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, এবং কোনোদিন সে অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নি। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন কবিতা দিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ, এবং ইতিহাস মানবস্বাধীনতাপ্রসারের ইতিহাস—তাঁর কাছে ইতিহাসের ওই একটিমাত্র অর্থ। তিনি ক্রোধের সঙ্গে বলেছেন—

যাঁরা মানববিদ্বেষী কিন্তু শক্তিমানের পূজা করেন / তাঁরা ইতিহাসে অনেকেই মনীষী বা ঋষি বলে চিহ্নিত/ আসলে তারা যে নির্বোধ এবং খুনী ও ডাকাতের নানা অপকর্মের উৎসাহদাতা / একথা সমকালের ঐতিহাসিকরা ভুলে যেতে চান। (পৃ ২১)

কবিদের কাছে তাই তাঁর আশা তাঁরা যথাযথ তথ্য প্রকাশ করবেন, তাঁদের অনুভূতি মিথ্যা বলে না।

নিজের অনুভূতির সততাই অন্যান্য প্রবীণ কবিদের সততা সম্পর্কে তাঁকে আশান্বিত করে; তরুণ কবিদের ওপরও তাঁর সে ভরসা ছিল:

তোমাদের মুখগুলি ক্রমেই মেঘের অতল থেকে স্পষ্ট হচ্ছে / আমার আনন্দ, আমি কিছু সত্যিকারের মানুষের মুখে দেখছি, / তাদের স্পর্শ করতে পারছি। / তোমরা আমাদের নির্ভয় হতে শিখিয়ে দাও, যেন / সামনের মৃত্যুকে আমরা অতিক্রম

করতে পারি।

যাঁরা সুযোগ বুঝে পক্ষ পরিবর্তন করেন তাদের তিনি ঘৃণা করেন :

বুড়োরা খেলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা / জিতলে দারুণ হাততালি, আর হার-লেও নেই ক্ষতি / সেই খবরও কাগজে ছাপবে এবং বেরুবে ছবি। / আমরাও জানি কী করে সইতে হয় সব দুর্গতি / তাছাড়া আছেন আমাদের প্রিয় কবি, যে কোনো / শিবিরে দারুণ মানায় তাঁকে—পৃ ১৬।

তিনি ছিলেন মানুষের কবি। তথাকথিত বড়ো মাপের মানুষদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ততটা ছিল না যতটা ছিল সাধারণ মানুষের ওপর—সাধারণ মানুষের সংহত শক্তির ওপর। তাই তিনি মিছিলের কবি : পথ চলতে-চলতে সহযাত্রী কবিকে জিজ্ঞাসা করছেন :

তাই কি তুমি বলতে চাইছ ; / মানুষ বলতে আমরা যাদের বুঝি / তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এতই 'তারা ঠুনকো অসহায় ? / কিন্তু সত্যিকারের মানুষ খড়ের তৈরি, কিংবা / কাঁচের পুতুল তো নয় / যাকে যখন ইচ্ছে বিকৃত বা ধ্বংস করা যায়। / তার ভবিষ্যৎ তার নিজের হাতে।

কবি চিত্ত ঘোষকে লেখা :

যা বলতে চাইছিলাম, সেদিন আমাদের মধ্যে / যেসব কথা হচ্ছিল, / একে-বারেই চলে যাবার আগে আমি কিন্তু মানুষের প্রতি / বিশ্বাস হারাতে রাজি নই।

এক-দুই কবিতায় প্রয়াত কবি দিনেশ দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন : 'আপনি ভিতরে বাইরে একটিই মানুষ ছিলেন, যার এখন সত্যিকারের অভাব।' কথাগুলি তাঁর সম্পর্কেও বলা চলে। দিনেশ দাস, অরুণ ভট্টা-চার্য, পুলিন সেনের মৃত্যুর খবর শুনে গেলেন তিনি যাবার আগে।

এই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—সাপ্তাহিক খবরের মধ্যে এক-একটি পরিচিত কোণ থেকে মৃত্যুর সাফল্যের ঘোষণা—নিজের পরাজয়ের তারিখ-টাকে যেন আচমকা ঘোষিত বলে মনে হয়—বেঁচে আছি কিনা অথবা সংবাদ বনে গেছি, নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ দিতে হয়, তাই বিছানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

কখনও-কখনও তাঁকে বিষণ্ণতার শিকার হতে দেখি—তখন তাঁর জন্য দুঃখ হয় : নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে—মানুষের কথা ভেবে, শিশুদের কথা ভেবে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়েন—এখন মানুষ বলতে যাঁদেরই সামনে দেখি / তাঁদেরই পিছনে ছায়ার মতো ঘুরছে এক বিষণ্ণতা ! / শিশুদের থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে

[পৃ ৫২]

ঘরগুলি ভাঙতে ভাঙতে / মানুষগুলি ভাঙতে ভাঙতে / চারদিকে এখন শুধু ভাঙনের শব্দ / কি জাগরণে, কি আমাদের ঘুমের ভিতর।

[পৃ ৫৩]

সুতরাং কেবল উচ্ছ্বাস নয়, কেবল সংকল্প নয়—গোটা মানুষটাকেই আমরা পাচ্ছি তাঁর শেষ কবিতাগুচ্ছ-সংকলনের মধ্যে দিয়ে—মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে অকুতোভয় প্রেমময় মানুষ-টিকে।

সবশুদ্ধ ৬১টি কবিতার সংকলন :

কবির জন্ম ২রা সেপ্টেমবর ১৯২০—মৃত্যু ১১ই জুলাই ১৯৮২। কবির শেষ লেখা ২৪শে জুন—১, ২৫শে জুন—১, ২৬শে জুন—৩, ২৭শে জুন—৩। ২৯শে অকটোবর ১৯৮৪ থেকে ২৭শে জুন ১৯৮৫ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে অবনী-রঞ্জন রায় আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

ভ্রষ্ট জীবনের বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠ

হে লোক সভ্যতা—আবু বকর সিদ্দিক। নওরোজ সাহিত্য সংসদ। ঢাকা। পনেরো টাকা।

পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা—সিকদার আমিনুল হক। দেশ, ৪৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫। দশ টাকা।

পাবলো নেরুদাকে একবার ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছিলেন, আপনার কবি-তায় বারেবারেই শিকড় শব্দটি ঘুরে-ফিরে আসে কেন ? প্রশ্নটি খুবই তাৎ-পর্যময় একজন কবির সত্যকে জানবার পক্ষে। বুঝতে কষ্ট হয় না নেরুদা কেন বারবার শিকড়ের কথা বলতেন। তাঁর দেশকাল তথা মানুষজনের হৃদয়ের গভীরে ছিল সেই শিকড় প্রোথিত। বাংলাদেশের এই দুই কবির কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়েও আমার কেবলি মনে হয়েছে এঁরাও সেই মর্মে প্রোথিত শিকড়-সন্ধানী। এ অন্বেষণ বাঙলার বর্ণমালার, মুখের ভাষার, স্মৃতি, স্বপ্ন ও সংগ্রামে।

কবিতা একটা দেশকে চিনতে সাহায্য করে যদি তার শিকড় ঠিক থাকে। সে কারণেই আবু বকর সিদ্দিকের কবিতাগ্রন্থের সূত্রপাত 'ভাড়ুদত্তের নহিদিন' দিয়ে আর তার সমাপ্ত 'আমাদের জলবতী মাতা' আর 'বিদায় দাও মা'র অশ্রুসিক্ত উদ্দীপ্ত পংক্তিমালায়। আমরা কবির হাত ধরে চলে যাই বাংলাদেশের অনু-ভবের চত্বরে, অবচেতনে, স্বপ্নে ও জাগরণে। এ বড়ো সুখের যাত্রা নয় সব সময়। তাকে আমরা আবিষ্কার করি বেদনায় আর আতিতে। এক-জন কবির পক্ষেই এই আবিষ্কারে যাওয়া সম্ভব। বাঙলা কবিতার এই উত্তরণের পিছনে রয়েছে একটি জাতি-সত্তার জাগরণ এবং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াস। বাংলাদেশের কবিতার এই স্বাতন্ত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে, প্রাপিতও করে নিজেদের দিকে তাকাতে।

সিদ্দিকের কবিতার ভিতরে আবহ-মানের পরিচর্যা যেমন আছে তেমনি রয়েছে সমকালীনতার প্রক্ষেপ। তাঁর কাব্যভঙ্গিতে তির্যক উচ্চারণ যেমন অনায়াসে মেলে তেমনি গভীর আত্ম-সমর্পণের মমসিদ্ধিও পাঠককে মুগ্ধ করে। সিদ্দিক শোনান আমাদের এই নষ্ট সভ্যতার কথা যেখানে প্রতিনিয়ত মানবজাত ভেসে যাচ্ছে। আমাদের বিবেকে শিহরন জাগে তাঁর এই উচ্চারণে : অনেক কিছুই তো কথা ছিলো, বাস্তিল ওপ্‌ড়ানোর ; / হলো না। বাসভর্তি যাত্রীরা চুপ করে বসে থাকে, / ছেলেটাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নাটোর পুলিশ।

(মানবজাত ভেসে যাচ্ছে)

নগর-বাবুদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি যখন লোকসভ্যতাকে আহ্বান জানান এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তখন কবির ভূমিকা নিয়েও আমাদের আর কোনো দ্বিধা থাকে না। বস্তুত গ্রন্থমধ্যে 'হে লোকসভ্যতা' কবিতাটি কবির বক্তব্যের নির্যাস অঞ্জলিতে ধরে আছে। পড়ে চমৎকৃত হই। পাঠকদের তার সামান্য অংশ উপহার দিই :

কবির কাছে যাও হে পর্যটক, / কোনো রাষ্ট্রকে সে শুভ্র ছায় না। / তার রুক্ষ পিঠ চেনে চাবুকের মার। / গম্বুজের উত্থান কী তার কাছে শোনো। / একদিন বসত ছিলো, পিড়িপাতা আসন ঘিরে / অন্নব্যঞ্জন ছিলো, সরিয়ে নিয়েছে। / এখন কানিশে বাস। চলো এই তো সময়। / যখন পেপারনোটে মুদ্রাস্ফীতি ও ঘরে ঘরে মন্দা, / যখন আঙুলচোষা শিশুর ক্লিনিকে ভরে আছে দিকচক্র, / ক্যামেরাবন্দী স্বাধী-নতা ও রক্তহীন জলোচ্ছ্বাস / শূল-ব্যথায় মগজের দিক্‌ভুল ঘটে আছে ; তখন / চলো, / হে নবকুমার, সমিধ বয়ে আনতে চলো।

(হে লোকসভ্যতা)

কবির এই দায়বদ্ধতা তাঁর গ্রন্থের কবিতাগুলোকে তাৎপর্য দিয়েছে অবশ্যই শুধু উপকরণ নির্বাচনের কারণে নয়, তাঁর শিল্পআঙ্গিক প্রয়োগেও সিদ্ধি স্বীকার্য। পূর্বসূরীদের কিছু প্রতিধ্বনি পাওয়া গেলেও সিদ্দিকের কবিতার নিজ-স্বতা তাঁর জোরালো বক্তব্যে, সারল্যে এবং তার যথার্থ উপস্থাপনায়। বাংলা-দেশের কবিতার এই কণ্ঠস্বর নতুন না হলেও তার চিরায়ত উপাদান এই নষ্ট সময়ে গভীর আশায় আলোকিত। সিকদার আমিনুল হকের কবিতার স্বাদ ভিন্নতর। সিদ্দিকের কবিতা যদি হয় হৃদয়বাদী, তাহলে এঁকে কবিকে বলা যায় মেধাবী। নাগরিকতায় পরিশীলিত এই কবিতাবলী পড়তে-পড়তে মনে হবে পরিচিত কবিতাই নতুন করে পড়ছি। দুঃখবোধের আবরণে এমন এক পরিপার্শ্বের পরিচয় এতে পাওয়া যায় যা আমাদের অনুভবকে বিমর্ষ এবং ক্ষুব্ধ করে তোলে। কেননা এ তো এই সময় আর সমাজেরই বিকার দেশে দেশে। তিনি আমাদের শুনিয়ে দেন তাঁর অভিরুচির কথা নিঃসংশয়ে।

এই দশকের কাছে আতিথ্য চাইনা / নর্দমার কাছে থাক আমার এ-ঘর, / অস্বাত শিল্পীর মুখে মিথ্যা স্বাভাবিক / অনুরোধ পোড়ে তাই গ্রাম ও নগর।

(এই দশকে)

নাগরিক অস্তিত্বে আন্তর্জাতিক বোধ এবং চেতনা ক্রিয়া করে অবিরত। কোনো কবির পক্ষেই তখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকা সম্ভব নয়। আমিনুল হকের পক্ষেও তাই বারেবারেই সম্ভব হয়েছে চোখ খুলে উতরোল সংগ্রামের দিকে তাকানো। কেননা তিনি দেখেছেন 'স্বজনের লাল রক্তে বিষাক্ত হয়েছে কত গলি। নিরুপায় এই দেশে, এশিয়ায়, কালো আফ্রি-কায়।' (কৃতী নক্ষত্রের পাশে)। এ-রকম পংক্তি তিনি অনায়াসে লেখেন। আমরাও কবির বোধের জগতের সঙ্গে পরিচিত হই। নগর-জীবনের চাতুর্যে অস্তিত্ব নিজের সংজ্ঞা হারায় কখনো-কখনো। কবির পক্ষে এরকম ভাবে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হলেও বর্তমান সমাজে এ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। 'মুখোশ' কবিতায় কবি চিরে-চিরে দেখান তার এই ফালতু সত্তাকে

যা মুখোশে আবৃত। 'কিন্তু মুখোশের নিচে / চলে এক অনন্ত ক্ষরণ আর দাউ দাউ অগ্নি।' এই সত্য আবিষ্কারের মধ্যেই থাকে কবির সার্থকতা। এই কবির নির্মাণশিল্পে নিপুণতা আছে এবং আছে সতর্ক সজাগ মন যা সংবেদনশীল। বাঙলা কবিতার বিবর্তনে বাংলাদেশের কবিদের নিজস্বতা যে স্থান করে নিয়েছে এই কবিতাগ্রন্থদুটিতে তার স্বাক্ষর রয়েছে। কবিদের অভিনন্দন।

কৃষ্ণ ধর

সিন্ধুস্বাদ অনুবাদ

পুবের জানালা—অতুলকুমার দত্ত। নীল-সরস্বতী প্রকাশন, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ১৯৮৪। ষোল টাকা।

মূলভাষা এবং লক্ষ্যভাষায় প্রায় সমান দক্ষতা সচ্ছল অনুবাদের প্রথম শর্ত। সংগত দ্বিতীয় শর্ত মূলরচনার সম্যক রসগ্রহণে অনুবাদকের তন্ময় মানসিকতা। তৃতীয়ত, রচনা যতখানি সম্ভব মূলানুগ রাখা অর্থাৎ তরজমা কখনোই যেন অনুবাদকের রুচি, পছন্দ আর বিশ্বাস অনুযায়ী মূল রচনাকে বদলে না দেয়। এই তিনটি শর্তই সতর্কভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন অনুবাদক অতুলকুমার দত্ত তাঁর 'স্বল্প, স্বল্পতর বা স্বল্পতম' বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান নিয়ে। চীনের ৯০টি, জাপানের ৮২টি এবং কোরিয়ার ৫৫টি কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটিতে রয়েছে। ইংরেজি কিছু অনুবাদ দেখার পর বলতে ভালো লাগে যে অতুলকুমার দত্ত বাঙলায় দক্ষ রূপান্তর করেছেন যা পরিশ্রমী প্রচেষ্টার দীর্ঘদিনের ফসল।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া চীনা, জাপানি কবিতার অনুবাদ বাঙলা সাহিত্যে প্রায় বিরল। কোরীয় কবিতার অনুবাদ আরো কম। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য উত্থানপদ বিজলী কোরিয়ার কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, বাঙলা অনুবাদসাহিত্য যতখানি পশ্চিমমুখী ততখানি পুবমুখী নয়। এই পটভূমিতে এতগুলি পুবদেশীয় কবিতার অনুবাদ একটি গ্রন্থের পরিসরে পাওয়া কম কথা নয়। সেদিক থেকে পাঠক লাভবান। বিনয়ী অনুবাদক 'পুবের জানালা' বলেছেন যেহেতু সহস্র বছরের পুরোনো সাহিত্যের সম্যক দিগন্ত উন্মোচন ১৮৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থে সম্ভব নয়। তবু বিন্দুতে সিন্ধুস্বাদ পাওয়া গেল বললে কি তা অর্বাচীন অতিশয়োক্তিরূপে অগ্রাহ্য হবে?

চীনের কবিতা প্রসঙ্গে যে পরিচয় অনুবাদক আমাদের উপহার দিয়েছেন তা থেকে আগ্রহী পাঠক জেনে নিতে পারছেন চীনা লিপির উদ্ভব থেকে সাম্প্রতিক কবিতা পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস। বর্তমানের ১০০ কোটি জনসমষ্টি উচ্চারণগত প্রাদেশিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও 'এক ভাষা-ভাববন্ধনে' একতা যুক্ত করে রেখেছে। সেই ভাষার সাহিত্যে 'মানবিকতাবোধ, যুক্তিবাদ ও সহজগ্রাহ্যতা'—এই তিনটি গুণ সবিশেষ লক্ষণীয়। চীনা কবিতায় একদিকে প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টবেদনাযন্ত্রণা, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ। 'বিশাল চীনা সাহিত্যে যুদ্ধ-প্রশস্তি এবং sex-এর নামগন্ধ নেই' কিংবা 'চীনাদের কাছে কাব্যের নায়ক-নায়িকা মর্ত্যের মানব-মানবী'—এই-সমস্ত সত্যভাষণ আমাদের অচেনা নয়—কিন্তু ফিরে পড়ার সুবাদে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হয়। কিন্তু অনুবাদকের কিছু আপাতসরলীকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হতে পারার বেদনাও রয়েছে: যেমন, 'কবিরা মুখ্যতঃ জনপালন-কৃতাক থেকে এসেছেন বলে কবিতা কখনই জনজীবন-চ্যুত হয় নি।'

চীনা কবিতার অনুবাদ থেকে একটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হল: নাম: ইন্দ্রধনু:

'কটি বন্ধন*দীপ্ত পূর্বাকাশে / অঙ্গুলি নির্দেশের সাহস কার? / কুলত্যাগিনী পলায়িতা তরুণীটি—/মাতাপিতা থেকে দূরে—অনুজাগ্রজ থেকে দূরে।

উষার আলোক পশ্চিমাকাশে ছোটে—/ বৃষ্টি নামল, ক্ষান্তি দ্বিপ্রহরে, / কুলত্যাগিনী পলায়িতা তরুণীটি / অনুজাগ্রজ থেকে দূরে—মাতাপিতা থেকে দূরে।

জানি তো তরুণটিকে—/শুধু চিত্তেশ—আত্মীয় সন্ধানী; / কখনো শপথ পালন করবে না সে, / কখনো স্বীকার করবে না ভাগ্যকে।'

কটিবন্ধনের টীকা দিতে গিয়ে অনুবাদক লিখেছেন, 'অবৈধমাতৃত্বে কটিবন্ধনের স্থূলতা, ফলে ইন্দ্রধনুর প্রতীকে স্বর্গের পাপঘোষণা'। এই রূপকল্পটির গূঢ়ার্থ জানা না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হত না। অনুবাদকর্ম এত সাবলীল যে অনায়াসে অনুবাদকের মৌলিক কবিতা বলে অনুভূত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এত প্রাণবন্ত অনুবাদ কম পাওয়া যায়। তবে একটি অভিযোগ—অনুবাদক রূপান্তরে একই ধরনের ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন সূচনা থেকে শেষ অবধি। কবি হুসিউং হুং-এর জন্ম ১৯৪০ সালে। তাঁর কবিতার অনুবাদে 'সুবাস', 'সোহাগ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনত্বের ছোঁয়া দেবার জন্যে এসব শব্দ চলতে পারে কিন্তু ১৯৪০ সালে জন্ম এমন বাঙালি কবি কখনই এই শব্দ দুটি ব্যবহার করবেন বলে আমাদের মনে হয় না।

জাপানি কবিতার ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছে বেদের ত্রিষ্টুভ ছন্দে রচিত শ্লোকগুলির কথা। তিনি জাপানি 'সেদোকা', 'চোকা', 'ইমায়ো' প্রভৃতি ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 'জাপানের কবিতা'র পরিচয়ে তানকা, হাইকু, এদো, সেনরু প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-কথিত ছন্দগুলির আলোচনা নেই দেখে একটু বিস্ময় জাগে বৈকি! আবার সাধারণত জাপানি কবিতা আকারে ক্ষুদ্র হলেও রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ জাপানি কবিতার অনুবাদ করেছেন।

'বেদনা মূলত সংযমের ব্যাপার'—তাই হয়তো জাপানিরা ক্ষুদ্রতর কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। দুটি অনুবাদ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাক: 'প্রিয়তম / দেখা দিল না যে-রাতে, / হেমন্ত বায়ু / সে অনাগতের চেয়ে / নিষ্ঠুরতর।' (সোনে যোশিতাদা)। 'ঝরে পড়া ফুল / বুকে নিয়ে / খেয়ার তরীটি ফিরে এল, / নদীর ওপারে / যাত্রী নামিয়ে দিয়ে।' (সম্রাট মেইজি)।

একসময় কোরিয়াকে বলা হত 'প্রভাতপ্রশান্তির দেশ' বা 'সন্ন্যাসীর দেশ' এখন কোরীয় কবিরা 'কবিতার দেশ' বলে আখ্যা দেন কোরিয়াকে। এখানে যে কটি কবিতার অনুবাদ পাওয়া গেল তা থেকে কোরীয় কবিদের দাবি যে কত সঙ্গত তা বোঝা যায়।

পরিশেষে গ্রন্থটি সম্পর্কে দু-একটি সাধারণ কথা নিবেদন করা যাক। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের সূত্রপাত। কাব্য ও সাহিত্যে নবজাগরণের মূলেও সেই ইংরেজি শিক্ষা যদিও আমাদের একটি উজ্জ্বল অতীত ছিল। অতীতের ধারাবাহিক অনুসরণ নয় বরং উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকার আজো বহুক্ষেত্রে মতাদর্শে জাগ্রত। মানসিকতায় বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গির এই অসঙ্গত প্রভাব চীন-জাপান-কোরিয়ার কবিতায় প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বদেশপ্রেম, রাজশক্তির প্রতি অনুরক্তি সংগ্রামে অনীহা, সমাজসচেতনতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, শালীন শোভন প্রেম, সরল সরল বক্তব্য এই দেশগুলির কবিতায় আবহমান কাল থেকে লক্ষণীয় এবং বলা বাহুল্য ভাবনা-উদ্রেককারী। সেদিক থেকে এই অনুবাদগ্রন্থ প্রয়োজনীয় এবং পিপাসু পাঠকের খানিকটা তৃষ্ণা অবশ্যই মিটিয়ে দিতে সক্ষম।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সে কি ভোলা যায়

[শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ]

বর্ণালী দাস

একশ পঁচিশ বছরের জন্মজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সারা দেশ যখন হুজুগে মত্ত, তখন যে-কোনো সচেতন বিবেকবান মানুষেরই কি একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় যে, দেশব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের এই ঘনঘটা আর আড়ম্বর একটা অভ্যাসক্রান্ত গড্ডলপ্রবাহমাত্র? একথা মনে হওয়া কি সংগত নয় যে, বিশ্বের সামগ্রিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্ত মানবসমাজ রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক চিন্তাচেতনার উত্তরাধিকার হয়ে এগিয়ে যাক, রবীন্দ্রসৃষ্টিসমগ্রের গভীর মর্মবাণীর সঙ্গে আত্মিক সূত্রে তার পরিচয় ঘটুক, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই বিপন্ন মানুষ শিখে নিক বিশ্বকে এবং মানুষকে ভালোবেসে বেঁচে থাকার কলাকৌশল?

রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের পন্থা হয়তো বহুবিধ, তবে তাঁর মৃতসঞ্জীবনী সৃষ্টিগুলিকে সাধারণ মানুষের নাগালের সীমানায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করা এবং সেই মহর্ষির জীবদ্দশার যাবতীয় স্মারকগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করার তত্ত্বাবধানও যে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনেরই একটি ধারা—সে বিষয়ে আশা করি কোনো বিতর্কের অবতারণা হবে না। কোনো রজতজয়ন্তী বা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নয়, এই কাজ আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে বহু বছর ধরে করে আসছেন যে শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি ঠাকুরপরিবারেরই জাতক—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র। এখানে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করছি অপর দুজনের নাম—যথাক্রমে কানাই সামন্ত এবং চিত্তরঞ্জন দেব—যাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত এবং নিঃস্বার্থ মমত্ববোধ এবং অকৃপণ শ্রম অর্পণ করে তিলে-তিলে গড়ে তুলেছেন এই মূল্যবান রবীন্দ্রস্মৃতি-ভাণ্ডারটিকে যা থেকে আজ যে-কোনো রবীন্দ্রগবেষক অনায়াসে সংগ্রহ করে নিতে পারেন বিবিধ দুর্লভ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর সন্ধান। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুঁথির মারফত রবীন্দ্রপাঠকমাত্রই উল্লিখিত নাম দুটির সঙ্গে পরিচিত, এবং বলাই বাহুল্য, তাদের কৃতিত্বের ইতিহাস 'রবীন্দ্রভবনে'র সর্ব অবয়বে অদৃশ্য এবং মূক অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

এই তিন সংগ্রাহকের মধ্যে অন্যতম প্রবীণ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েক মাস আগে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। পূর্বপল্লীতে তাঁর নিজের বাড়ি। সৌম্যদর্শন সত্তরোর্দ্ধ মানুষটি এখনও নিয়মিত রবীন্দ্রভবনে আসেন। বাড়ি গিয়ে একদিন আমার প্রস্তুত প্রশ্নাবলী পৌঁছে দিয়ে এলাম। পরের দিন রবীন্দ্রভবনে দেখা হল। অবসর নিয়েছেন বহুদিন। এখনও নিত্য আসেন প্রাণের টানে। বসবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর অটল আসন। একটি চেয়ারে কৃষ্ণ কৃপালনীর পর থেকে তাঁরই স্থান সুনির্দিষ্ট। তবুও দুটি সাদামাটা চেয়ারে অফিস-ঘরেই বসলাম। বুকপকেট থেকে উঁকি দিচ্ছিল আমার গতদিনের দেওয়া প্রশ্নের তালিকা। বার করে নিজেই পড়লেন—

ঠাকুরপরিবারের একজন মানুষ হিসেবে এ পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এবং যোগাযোগটা কেমন ছিল?

সাক্ষাৎকার

অবন ঠাকুরের দৌহিত্র হিসেবে আমার জন্ম হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। বাল্য, শৈশব, এমনকি কৈশোর পর্যন্ত কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই কেটেছে। অন্তত তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত জোড়াসাঁকোতেই ছিল আমার বসবাস। আমাদের বাড়িটা ছিল জোড়াসাঁকোর সেই বিখ্যাত পাঁচ-নমবর বাড়ি—এখন সে বাড়ি ভেঙে গেছে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বলে দাদামশায়ের যে বই—নিশ্চয়ই তোমার পড়া আছে—তাতে সেই বাড়ির সব ধারা ভারি সুন্দর করে লিখেছেন উনি।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার লেখাপড়ার গল্প, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের শিক্ষাব্যবস্থা রীতিপ্রণালী আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগে, কৌতুককর মনে হয়—মানে "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিচারণা করেছেন। আপনার শৈশবশিক্ষার সময়েও কি সেই ট্রাডিশন চলেছে?

উনি যেকালে ঠাকুরবাড়ির ছোটো ছেলে ছিলেন সে যুগটা বহু আগের। আমাদের পরিবারটা শিক্ষায়-দীক্ষায়-সংস্কৃতিতে চিরকালই খুব কেতাদুরস্ত ছিল, সুতরাং ছেলেদের সর্বদা নানাবিদ্যায় চৌকস করে তোলার আয়োজন চলত। আমরা যখন ছোটো, তখন বাড়ির ধারা খানিকটা শিথিল হয়েছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি বদলায় নি। আমাদের বাল্যশিক্ষা গৃহশিক্ষকের কাছে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রথায়। একটা পারিবারিক সংস্থা ছিল। নাম "বিচিত্রা"। এ নামে বাচ্চাদের একটা স্কুলও ছিল, "বিচিত্রা স্কুল"। আমি সেই স্কুলে পড়েছি। বাড়ির সব ছেলেমেয়েরই প্রাথমিক শিক্ষা হত সেই স্কুলে। মনে পড়ে, অজিত চক্রবর্তী, জীবনময় রায়, নন্দলাল বসু—এঁদের কাছেই আমার বাল্যশিক্ষা হয়েছিল এই স্কুলে। আমি অবশ্য বড়ো হয়ে হেয়ার স্কুলে পড়েছি।

আপনার দাদা মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা কীরকম ছিল? কিছু স্মৃতিচারণ করুন।

দাদার সঙ্গে ভাইয়ের যোগাযোগ যেমন থাকে—অত্যন্ত গাঢ়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা দু ভাই ছিলাম বন্ধুর মতো। ওই যে দাদার লেখা "দক্ষিণের বারান্দা", তুমি নিশ্চয়ই জান, ওতেই কতরকম স্মৃতিকাহিনী ধরা আছে। বইটা লিখবার সময় আমিও দাদাকে নানারকমভাবে সাহায্য করেছিলাম। 'স্মৃতিকথা' বলতে তোমরা যা শুনতে চাইছ, সবই আছে ওই "দক্ষিণের বারান্দা"য়। আবার আমি বলতে গেলে পুনরুক্তি হয়ে যাবে।

জোড়াসাঁকোয় থাকার সময় সময়েই কি কবির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়?

আদৌ না। ওঁকে যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখেছি, তখন আমি নেহাত ছোটো। ওঁর কাছাকাছি ঘেঁষার সুযোগ বড়ো একটা ছিল না। দূর থেকে দেখতাম, কাঁচায়-পাকায় মেশানো চুল, গাড়া লম্বা শক্তসমর্থ মানুষ। বাড়ির ছেলেমেয়েদের নানান উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর আমন্ত্রণ ছিল বাঁধা। তিনি সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন আর আগাগোড়া অনুষ্ঠান শুনতেন। এর বেশি সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ সেই বয়সে ঠিক ছিল না, কারণ বয়সের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। আর আমাদের পরিবারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠর মধ্যে দূরত্ব কী মারাত্মক—সে সম্পর্কে ধারণা তোমার নিশ্চয়ই আছে। আমি তখন নিতান্ত শিশু—সুতরাং আমার পক্ষেও দূরত্ব নস্যাৎ করে তাঁর সান্নিধ্যলাভ সম্ভব হয় নি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটেছিল যখন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে আমি আসি। মনে পড়ছে প্রথম এসেছিলাম বৃক্ষরোপণে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আপনি যুক্ত হলেন কখন কীভাবে?

আমি বিচিত্র লাইনে পড়াশুনা করেছিলাম। সংস্কৃতও পড়েছি, আবার অ্যাকাউনটেনসিও, আবার লাইব্রেরিয়ানশিপও, আবার অভিভাবকদের ইচ্ছে ছিল আমি আইন পড়ে ওকালতি করি। যাই হোক, বিশ্বভারতীতে একবার লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেনট্-এর একটি পদ খালি হল, তো আমি ওই পদটির জন্য দরখাস্ত করলাম। কিছুদিন পর রথীদা দাদাকে বললেন—শোভনলাল কি রবীন্দ্রভবনে কাজ করতে রাজি? তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। সময়টা ১৯৪৪ সাল। আমি তো সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ এর আগে দাদামশাই বেঁচে থাকার সময় শান্তিনিকেতনে বেশ কয়েকবার বেড়াতে এসেছি—জায়গাটা ভারি পছন্দ ছিল আমার। মাত্র কজন লোক তখন রবীন্দ্রভবন পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছেন—প্রবোধচন্দ্র সেন, কৃষ্ণ কৃপালনী, এঁদেরই একজন সহকর্মী হিসেবে রবীন্দ্রভবনের কাজে লেগে গেলাম। মনে আছে "উদয়নে"র একখানা ঘরে তখন রবীন্দ্রভবনের অফিস ছিল।

আপনার মুখে একটু রবীন্দ্রস্মৃতিচারণা শুনতে চাই।

স্মৃতিকথা অজস্র। সব কি তোমরা ধৈর্য ধরে শুনতে পারবে? কলকাতার ছাত্র-জীবনে যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলাম তখন দাদামশাই অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। সেখানেই কর্তাবাবাকে (দাদামশায়ের কাকা, সেই সূত্রে আমরা ওকে কর্তাবাবা বলতাম) কাছ থেকে দেখার বা সান্নিধ্য পাবার একটা সুযোগ হল। ওঁর সঙ্গে একদিন স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। মনে আছে, বর্ষামঙ্গলের সময় উনি একবার দাদামশাইকে বললেন, কালিদাসের 'ঋতুসংহার' থেকে বর্ষা-আহ্বান তৈরি করতে—আর আমাকে বললেন সংস্কৃত শ্লোকগুলো পড়তে। কারণ উনি জানতেন যে, আমি তখন স্কটিশে সংস্কৃত নিয়ে পড়ি। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। সংস্কৃত কখনো পড়তে পারি? পারতাম না একেবারে তা নয়, আসলে আমি একটু ভীতু আর লাজুক প্রকৃতির ছিলাম, আর আত্মবিশ্বাসও ছিল বেশ কম। গুরুদেব খুব বিরক্ত হলেন, একটু রাগারাগি বকাবকি করলেন। যাই হোক, সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলাম। সর্বসমক্ষে দাঁতভাঙা সংস্কৃত শ্লোক পড়তে হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত দাদামশাই

নিজেই সেগুলিকে বাঙলায় তরজমা করে পড়ে দিয়েছিলেন। আরো একটা ঘটনা মনে পড়ছে—দাদামশাই তখন খুব যাত্রা লিখতেন। একবার কয়েকটা চটি খাতায় সরু-সরু টানা লাইনে যাত্রার পালা কপি করে আমাকে বললেন—'রবিকার কাছে এটা নিয়ে যা তো'। দাদা (মোহনলাল) আবার খাতাটার মলাট করে দিয়েছিলেন। তো আমি খাতাটা নিয়ে প্রথমে গেলাম রথীদার কাছে। রথীদার হাত দিয়েই জিনিসটা পাচার করে দেবার মতলব আর কি। রথীদা বোধহয় ভাবলেন, আমার নিজের লেখা, তাই বললেন 'তুই নিজে হাতেই বাবামশাইকে দে না।' অগত্যা আমিই গুটিগুটি গেলাম রবি দাদামশাইয়ের কাছে—খাতাটা হাতে দিতেই উনি বললেন, 'কী রে, তোর লেখা না কি—'? আমি মাথা নেড়ে জানালাম 'না, দাদামশায়ের।' উনি বললেন দে দে। তোর দাদামশায়ের লেখা খুব পরিষ্কার নয় বটে, তবে আমার পড়তে অসুবিধা হয় না। খুব ছেলেবেলায় এর থেকে বেশি ওঁর কাছে যেতে পারতাম না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ওঁকে দেখেছি—যা লিখতেন তা-ই পাঠ করতেন। যখন ওঁর অনেক বয়স, তখনও দেখেছি জোড়াসাঁকোতে, "গুপ্তনিবাসে" কিংবা (বরানগরের) 'শশীভিলাতে অথবা শান্তিনিকেতনের নিজের বিভিন্ন রচনা পাতার পর পাতা পাঠ করতে। এখন মনে পড়লে ভারি অবাক লাগে—উনি কিন্তু কখনো চেয়ারে বসে পড়তেন না—তা সে তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা যতক্ষণ সময়ই লাগুক না কেন। চিরকাল দেখেছি, মেঝেতে সতরঞ্জি পেতে বাবু হয়ে বসে ঠায় পড়ে গেছেন। চিন্তা করো, "মালঞ্চ", "শেষের কবিতা", এমনকি "যোগাযোগ"-এর মতো মোটামুটি বড়ো উপন্যাসও উনি একভাবে পা মুড়ে বসে পড়ে যেতেন। কখনো ওঁকে ক্লান্ত হতে দেখি নি, কখনও ভঙ্গিও বদলাতে দেখি নি। কী ভেবে ওভাবে বসতেন কে জানে? হয়তো দর্শকদের সঙ্গে সমান আসনে বসতে চাইতেন।

আমরা শুনেছি, রবীন্দ্রভবনকে তিল-তিল করে গড়ে তোলার পেছনে আপনার আন্তরিক প্রযত্ন এবং নিষ্ঠাই সর্বাধিক। কিভাবে এমন একটি তথ্যসমৃদ্ধ সংগ্রহশালা আপনি গড়ে তুললেন, একটু বলুন।

রবীন্দ্রভবনের চাকরিটা কিভাবে পেলাম, তা তো তোমায় বলেছি। অভিভাবকরা তো আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। বোঝই তো, সব অভিভাবকই তাঁদের সন্তানের মস্ত বড়ো কেরিয়ার প্রত্যাশা করেন। রবীন্দ্রভবনের চাকরিতে আমার বৃহৎ আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কমই ছিল—আর সেইজন্যই তাঁদের আপত্তি। সে যাই হোক, প্রথম যখন কাজ শুরু করলাম, তখন বেতন মাত্র আশি টাকা, আর কর্মী বলতে আমরা পাঁচ-ছ জন। প্রবোধবাবু, রূপালনীজী, আমি আর চিত্তবাবু (চিত্তরঞ্জন দেব)। আর ছিলেন অমিয় সেন। হ্যাঁ, আমি অকপটে স্বীকার করছি, তখন রবীন্দ্রভবনকে গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় চিন্তা আমার মস্তিষ্কে ছিল না। পুলিনবাবু (পুলিনবিহারী সেন) এ নিয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন অনেক—'আপনার তো মশাই রবীন্দ্রভবন ধ্যানজ্ঞান।' হ্যাঁ, একশোবার। একে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। এখন রবীন্দ্রভবনের জন্য সরকারের দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই, কিন্তু গোড়ার দিকে, মনে আছে, মাত্র দুই কি তিন হাজার টাকা বছরে, অনেক আবেদন-নিবেদন করে তবে পাওয়া যেত। মান্ধাতার আমলের ঝরঝরে ভাঙা "ফোটোকপিয়িং মেশিন" নিয়ে বছরের পর বছর হাজার ঋনঝাট-ঝামেলা-সমেত প্রকাশনার কাজ চালিয়ে গেছি। কানাইবাবু তো এখনও করছেন সেই কাজ। অবশ্য এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেক। আসলে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষের সময়ই টনক নড়ল সবার। ওঁর যাবতীয় পাণ্ডুলিপি বা জিনিসপত্রের যে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে, সে কথাটা বুঝতেই সময় বয়ে গেছে অনেক। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও নিউজ ক্লিপিং এর ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। ক্যাটালগও তৈরি হয়েছে আমার চাকরির চল্লিশ বছরের মধ্যে। আমি রিটায়ার করে যাবার পর একটি জেরক্স্ মেশিন রবীন্দ্রভবন পেয়েছে। এখন অবশ্য বছরে বহু টাকা ব্যয় হয় রবীন্দ্রভবনের জন্য। টাকাগুলো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ, যেন অপব্যবহার না হয়, কারণ এর উন্নতি আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেনের রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীটির প্রস্তুতিতে আপনার ভূমিকা কী ছিল?

গ্রন্থপঞ্জীটির প্রস্তুতিতে পুলিনবাবুকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। গোড়ার দিকে উনি বইগুলির পাণ্ডুলিপি দিচ্ছিলেন। আমি তখনই ওঁকে সাবধান করেছিলাম—এত অজস্র পাণ্ডুলিপি কি দেওয়া সম্ভব? পরে আমার কথাই মানতে হল ওঁকে। এইরকম বইটি তৈরির সময়—

আমাদের মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক নানাসময় বাধত, আবার মিটমাট হয়ে যেতেও সময় লাগত না। যাই হোক, খেটেখুটে যেটা দাঁড়িয়েছিল সেটা নেহাত মন্দ হয় নি।

সৃষ্টির তুলনায় নির্মাণের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আমরা বেশি দেখি—এর কারণ কী?

সৃষ্টি বলতে কি লেখালেখির কথা বলছ? আসলে আমি লিখি না কুঁড়েমির জন্য। দাদা তো লিখেইছেন। দাদার লেখা "দক্ষিণের বারান্দা"য় যা আছে ওই সবই আমারও বক্তব্য। আলাদা করে কিছু লিখতে গেলেই রিপিটিশন হয়ে যাবে, পড়বে না কেউ।

আপনি কি এখনও রবীন্দ্রভবন সংস্থার সঙ্গে পূর্ববৎ জড়িত?

না। আগের মতো নয়। একটা সময় ছিল যখন কি পেশায়, কি নেশায় রবীন্দ্রভবনই ছিল আমার সর্বস্ব। এখন আসি দেখতে-শুনতে, অথবা বলতে পার মায়ার টানে।

রবীন্দ্রভবনের জন্য আপনার আন্তরিকতা প্রমাণ করে, আপনি একজন রবীন্দ্রসংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। আপনি কি আর অন্য কোনো রকমভাবে রবীন্দ্রসংস্কৃতির চর্চা করেছেন? বা এখনও করছেন?

রবীন্দ্রসংস্কৃতিচর্চা বলতে তোমরা কী বোঝ জানি না। তবে চারপাশে ওঁকে নিয়ে যে বিরাট হই-হই রই-রই হচ্ছে, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা বা নতুনভাবে অনুভব করার কাজ আদৌ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। রবীন্দ্রসংস্কৃতিচর্চা করতে হবে বলে তো আমরা কিছু করি নি। একটা দায়ত্ববোধ, একটা মমতা এসে গিয়েছিল। ওঁর লেখা নাটক করেছি—সংস্কৃতিচর্চা করতে হবে বলে নয়। শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি ওঁর নাটককে। মনে আছে, "তাসের দেশে" একবার আমি রাজার পার্ট করেছিলাম। দিল্লী থেকে যখন আমন্ত্রণ এল, তখন পার্ট নিলাম সম্পাদকের। কলকাতায় মহাজাতিসদনে সপ্তদাগরের ভূমিকাও করেছি। "ডাকঘর" যখন হল প্রতিমা দেবীর নির্দেশনায়, তখন ঠাকুরদা হয়েছিলাম। আরো একবার পিসেমশাইয়ের পার্ট করার কথা, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম, অগত্যা মোড়লের পার্ট করতে হল। শান্তিনিকেতন থেকে যখন যা নাটক হত, অভিনয় করতাম। "বৈকুণ্ঠের খাতা"য় বৈকুণ্ঠ আর অবিনাশের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, "রক্তকরবী"তে নেপথ্যে রাজা, "অরূপরতনে" রাজা বিক্রমদেব। আমাদের একটা নাটুকে দল ছিল, আমি ছিলাম তাদের মধ্যকার একজন। অভিনয় করতে ভারি ভালোবাসতাম আমরা। রবীন্দ্র-প্রযোজনার বাইরেও আমরা বহু নাটক করেছি—যেমন, 'রাতারাতি'তে নকুড়মামা, অবনীন্দ্রনাথের হংসমামা আর লম্বকর্ণ পালাও একবার আমরা করেছিলাম। কর্তাবাবার সঙ্গে অভিনয় কলকাতায় "শেষবর্ষণ"। মনে আছে, সভাসদদের মধ্যে দাদামশাই (অবনঠাকুর) আমাকে বসিয়ে দিলেন। কোনো সংলাপ ছিল না। আর মনে আছে "ওসপার ওসপার" বলে একটা নাটক করেছিলাম। গানগুলোতে সব দাদামশায়ের নিজের সুর—সে নাটকটা দারুণ জমেছিল। আমি তো একটা হুঁকো নিয়ে ঘুরছিলাম—এখন মনে পড়লে খুব মজা লাগে। আসলে শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম একটা যৌথ পরিবারের মতো। একের আনন্দে সবার আনন্দ, একের দুঃখে সকলের দুঃখ, একের উৎসবে সকলের উৎসব। গুরুদেবের মৃত্যুর পরও আশ্রমের প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্কের এই আন্তরিকতা, এই উষ্ণতা ছিল। এই অন্তরঙ্গ উত্তাপের স্পর্শ এখন আর পাই না। বুঝি, আক্ষেপের কোনো কারণ নেই। দিনকাল অনেক বদলে গেছে, আর আমার ক্ষেত্রে দিন ঘনিয়ে এসেছে বলেই বোধহয় পুরোনো দিন মনকে আরো টানে। বুড়ো বয়সেই কি মানুষ বেশি নস্টাল্‌জিক হয়ে পড়ে? নইলে সেই ফেলে-আসা শান্তিনিকেতনের বিবর্ণ স্মৃতি—এত কেন পীড়া দেয় বলতে পার?

স্মৃতিভারে আপ্লুত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে আবেগে ধরাশায়ী মনে হচ্ছিল। এদিকে বেলা অনেকটা দীর্ঘ হয়েছে। মধ্যাহ্নসূর্য মাথার ওপর থেকে অকরুণ অগ্নিবর্ষণ করছে। তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই কিছুটা ছন্দপতন ঘটিয়েই বললাম, 'বাড়ি ফিরবেন না? অনেক বেলা হয়েছে যে।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ। আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলাম, তাঁরই রক্তের অণুপরমাণু দিয়ে নির্মিত রবীন্দ্রভবনের কক্ষ থেকে।

বস্তির দলিল : সাহিত্য ? প্রতিবেদন ?

সাহিত্যের পাঠককে সাধারণত দুটি প্রধান স্থূল ভাগে বিভাজিত করা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি কাহিনীভুক্ত এবং অল্পে সন্তুষ্ট। দ্বিতীয় দলটি খুবই নগণ্য সংখ্যায়, কিন্তু এঁরাই সাহিত্যের আগামী কালের রুচি নির্ধারণ করে দিয়ে চলে যান। এঁরা লিখনশৈলীর এবং কাহিনীর বৈচিত্র্যের পিপাসু। এঁরা নিদ্রাকর্ষণ বা অবকাশবিনোদনের সঙ্গী হিসেবে লেখাকে গ্রহণ করেন না। এই দ্বিতীয় দলটির অধিকাংশই হয় লেখক বা বিদগ্ধ জন। এই দ্বিতীয় দলটির কাছে দোমিনিক লাপিয়ের-এর "লা সিতে দ লা জোয়া" বা "দ্য সিটি অব জয়" অথবা "আনন্দনগর" সে অর্থে আদৃত হতে পারে না, এবং হয়ও নি। নিজের দেশে অর্থাৎ ফ্রান্সে দোমিনিক যথেষ্ট জনপ্রিয় কিন্তু নিবিষ্ট পাঠকের কাছে লঘু লেখক হিসেবে চিহ্নিত। রামাতুয়েল-এ বাড়ি এই লেখক বিবাহিত, এবং তাঁর একমাত্র কুড়ি বছরের কন্যা আলেকজান্দ্রাও লেখিকা। "লা লিয়োন্ দ বুলেভার" বা "রাজপথের সিংহী" নামের একটি গ্রন্থ আলেকজান্দ্রা লিখেছেন। দোমিনিক-এর লেখক-জীবনের শুরু মাত্র সতেরো বছর বয়সে এবং ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকা "পারী ম্যাচ"এ দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে সুপরিচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস "স্যাঁ দলার লে মিল কিলোম্যাত্র" (হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের ডলার) ফ্রান্সের সর্বাধিক-বিক্রীত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে "লুন দ মিয়েল ওত্যুর দ লা তের" (পৃথিবীর চারদিকে মধু চাঁদ), "স্যাঁ লিবেরতে সুব্ লে রুত দ ইউ, এর এস, এস" (সোভিয়েত রাশিয়ার পথের উপর স্বাধীনতা) "রুসি পরত উভেরত" (সোভিয়েত রাশিয়ার খোলা দরজা) "চেসম মা দি" (দাবাড়ু আমাকে বলেছিল)। ১৯৬০ সালে তার সঙ্গে লারি কলিনসের নিবিড় বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁদের যুগ্ম প্রয়াস "পারী ব্রুল-তিল ?" (পারী কি জ্বলছে ?) প্রকাশিত হয়। এর পরে এঁদের যুগ্মপ্রয়াসগুলি হল "উ তু পরতোরা মঁ দই" (আমার দুঃখ তুমি কোথায় রাখবে ?), "ও জেরুজালেম", "সেত নুই লা লিবেরতে" (স্বাধীনতার সেই রাত), "ল স্যাঁকিয়েম্ কাভালিয়ে" (পঞ্চদশ অশ্বারোহী)। লারি কলিনসের সঙ্গে দোমিনিকের সম্পর্ক ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জীবন্ত ছিল। দোমিনিক স্তেফান গুয়েফ-এর সঙ্গেও একটি গ্রন্থ লিখেছেন—তার নাম "লে কেয়দ্ দ নিউইয়রক্" (নিউইয়রকের আরব মিলিটারি প্রধানেরা)।

বছর কয়েক আগে দোমিনিক কলকাতায় আসেন এবং হাওড়ার একটি বস্তিতে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে যান। হাওড়ার এই পিলখানা বস্তিতে সেবা-সঙ্ঘসমিতি নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে ফরাসী দম্পতি লিও ও ফঁসোয়াজ দীর্ঘদিন ধরে বস্তিবাসীর সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনার সমব্যথী অংশীদার। এই বাস্তির কাল্পনিক নাম দিয়েছেন দোমিনিক 'লাসিতে দ লা জোয়া" বা আনন্দনগর। এখানকার নিতান্ত দরিদ্র, জীবনসংগ্রামে অস্থির কিছু মানুষ-মানুষীর কাহিনী এই "আনন্দনগর"। ফ্রান্সে এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। প্রকাশ করেছিলেন রবের লাফোঁ। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬র গোড়ার দিকে। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন ক্যাথারিন স্পিন্থ। গেল ফেব্রুয়ারি মাসের কলকাতার বইমেলায় এই বইটি সবথেকে বেশি বিক্রি হয়েছিল। অন্তত বেসরকারি হিসেব তাই বলে। যদিও বইটি বিদেশী পাঠকের আগ্রহকে উশকে দেবার জন্যেই লেখা, তবু এই বইটি কলকাতার অজস্র কৌতূহলী পড়ুয়ার সমাদর লাভ করেছে। এই গ্রন্থের বিক্রি ল্যারি কলিন্স্ এবং দোমিনিক-এর যুগ্ম প্রয়াস 'ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট' বা "সেত্ নুই লা লিবেরতে"র চেয়ে বেশি। এখন কলকাতায় অনেক বইয়ের দোকানে বই দুটিকে একসঙ্গে এক ফিতের বাঁধনে বেঁধে বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে।

আনন্দনগর বস্তিতে সত্তর হাজার মানুষের বাস। এই-সমস্ত মানুষ যে কী নিদারুণ গ্লানিতে, হতাশায় আর বঞ্চনার মধ্যে দিনগুলি রাতগুলি কাটিয়ে দেন, তারই এক সপ্রতিভ আলেখ্য দোমিনিক ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পাঠের অদ্ভুত তীব্রতার শেষে গ্রন্থটিকে যুক্তির নিক্তিতে ওজন করতে গিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, বিশেষত কলকাতার সঙ্গে যাদের জীবন জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন। যদিও তিনি অনেক বাঙলা আর হিন্দি শব্দ ব্যবহার করে কাহিনীটিকে পরিবেশগত বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে চেয়েছেন তবু তার ভ্রান্তি, অনেক শব্দের মর্মার্থ-অনুবাদের ব্যর্থতা আমাদের চোখে পড়ে যায়ই।

ফাদার স্তিফান কোভাল্স্কি এই বস্তিতে এসে উঠলেন দরিদ্র আর্ত মানুষদের মধ্যে সেবার ব্রত নিয়ে। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত অন্তরাত্মার গ্লানির উপর পরম করুণাময় যীশুর বাণীর শুশ্রূষা দিতে তিনি এলেন। তিনিই এই উপাখ্যানের কেন্দ্রচরিত্র। বস্তির একটি ঝুপড়িতে কোভাল্স্কি আশ্রয় নিলেন। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে এই ঝুপড়িতে কুঁকড়ে শুতে হয়। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ফুটো চালের তলায় আরশোলা, মশা, মাছি, কাঁকড়াবিছের সঙ্গে সহবাস করতে হয়। নিকাশি নরদমায় যেন হাজার বছরের নোংরা কাথ, জলের জন্য লম্বা লাইন, চারদিকে উৎকট গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তিনি দেখতে পান মানুষের যন্ত্রণাময় অস্তিত্বকে—শুনতে পান তাদের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। প্রতিদিনকার অমার আড়ালটুকু থেকে তবু যেন কোথাও জ্যোতির্ময় আলোর সম্ভাবনা তরঙ্গময় হয়ে উঠছে—এই উপলব্ধিও তাঁরই।

গ্রন্থটি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম "তোমরা পৃথিবীর আলো", দ্বিতীয়াংশের নাম "মানুষ বোড়া এবং জলন্ত রথ" এবং শেষাংশের নাম "কলকাতা আমার ভালোবাসা"। পরিশেষকথন দিয়ে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি।

প্রথমাংশের অনেকটাই জুড়ে হাজারি পালের কাহিনী। কাঁকুলি গ্রাম থেকে হাজারি চলে এসেছে কলকাতায় রুজির সন্ধানে। সঙ্গে তার স্ত্রী অলকা, দুই ছেলে আর একটি মেয়ে। দুর্ভিক্ষকবলিত সেই গ্রামের অনেকেই চলে এসেছে কলকাতায়। ওদের আগে এসেছিল যে পরিচিত মানুষটি সে বড় বাজারে কুলিগিরি করত। তার শুধু নাম জানে হাজারি—ঠিকানা জানে না। আসলে এমনিধারা মানুষের ঠিকানা তো ফুটপাথ। সুতরাং হাজারি তার খোঁজ পায় না। কিন্তু জীবন তো বসে থাকে না। সে ঘুঁড়িয়ে-ঘুঁড়িয়ে হলেও চলে। বেশ কদিন হাওড়া স্টেশনের চত্বরে ওদের দিন কেটে যায়। তারপর একদিন পুলিশের তাড়ায় সেই আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। চলে আসে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে এপার কলকাতায়। ফুটপাথে অজস্র পরিবার। তাদের সাথেই একদিকে ঠাঁই করে নেয়। একদিন এক ঠেলাওয়ালা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর বদলে কাজ করে কিছু পয়সা পায়। ঠেলাওয়ালা আবার অসুস্থ হবে কবে, সেই আশায় হাজারি অপেক্ষা করতে থাকে। কী নিদারুণ অভাব আর হতাশার মধ্যে দিন কাটে। তারপর একদিন রক্ত বিক্রি করে টাকা রোজগারের সহজ পথ পেয়ে যায়। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি—গরিবের রক্তেরও কোনো দাম আছে। রক্ত বিক্রি র চল্লিশ টাকার মধ্যে ও পায় সাড়ে সতেরো টাকা। বাকিটা যায় দালালদের হাতে। এর পরে যখনি অভাব সহন-সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখনি সে রক্ত বিক্রি করে টাকা উপার্জন করেছে। এরই মধ্যে একদিন একটি কুলি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সেই রামচন্দ্রই হাজারিকে রিকশা ভাড়ায় নিয়ে চালানোর বন্দোবস্ত করে দেয়। জীবনে একটুখানি নিশ্চয়তা আসে।

প্রথমাংশের পরের দিকটিতে স্তিফান কোভাল্স্কির কাহিনী শুরু। তিনি এলেন মঙ্গলবার্তা নিয়ে আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে। স্থানীয় চার্চের রেক্টরের পছন্দমত আরামদায়ক ঘর নিতে কোভাল্স্কি অস্বীকার করলেন। তিনি এসে উঠলেন আনন্দনগর বস্তিতে। তাঁর মনে হয়েছিল 'আমার নিজেরই প্রয়োজন অন্যদের, অন্যরা আমাকে নিয়ে কী করবে!' এই মানসিকতাই একদিন তাঁকে বস্তিবাসীদের প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে ফেলতে সাহায্য করল। তিনি ওদের একজন হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়াংশে কোভাল্স্কি কেমন করে সেবায়, মমতায়, শুশ্রূষায় ধীরে-ধীরে বস্তিবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটালেন তারই প্রকাশ উন্মোচিত হয়েছে নানা ঘটনার হাত ধরে। কোভাল্স্কির জীবনময় একটিই উচ্চাশা—তিনি কেমন করে বস্তিবাসীদের ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়ে তুলবেন যাতে তারা বুঝতে পারে তারা পরিত্যক্ত নয়, এবং এই বোধ থেকেই জন্ম নেবে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের শপথ। মারগারিতার নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠিত হল যারা শুনবে সবার অসুবিধার কথা এবং তার প্রতিকারের চেষ্টায় সম্মিলিতভাবে সক্রিয় হবে। এদের প্রধান কাজ হল অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া।

এর পরেই কোভাল্স্কির কলেরা হল। মারগারিতা চেয়েছিল তিনি বেলভিউ নারসিং হোমে যান। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং হাসপাতালে যেতে চাইলেন—যেখানে শুধু ধনীদের নয়—সবারই চিকিৎসা হয়। বস্তিবাসীদের চাঁদায় কোভাল্স্কির চিকিৎসা চলে এবং তিনি

শীগগিরই রোগমুক্ত হন। তারপর কুষ্ঠ-কলোনিতে গিয়ে তিনি আনোয়ার আর অন্যান্যদের দেখে আসেন। এরাও তাঁর চিকিৎসার জন্যে ভিক্ষাংশ দিয়েছিল। পরে মাদার তেরেসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুষ্ঠরোগীদের জন্যে একটি ক্লিনিক চালাবার সাহায্যপ্রার্থী হন কোভাল্‌স্কি। মাদারও রাজি হয়ে যান এবং তিনজন সিস্টার পাঠান। এই সময়ই সুদূর ফ্লোরিডা থেকে ম্যাক্‌স্ লোয়েব কোভাল্‌স্কির ক্লিনিকে ডাক্তারি করতে এলেন।

এবার আবার হাজারির কথায় ফিরে এসেছেন লেখক দোমিনিক। যে বন্ধুটি তাঁকে রিকশাওয়ালা হতে সাহায্য করেছিল সেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করে মহাজনের ঋণ শোধ করতে গিয়ে। হাজারি পালই তার মুখে আগুন দিয়ে শেষ বন্ধুকৃত্য করে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে রিকশাপুজা করার কথাও বেশ দীর্ঘ বর্ণনায় লেখক বলেছেন। রিকশা-মালিকেরা ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ায় রিকশাওয়ালারা ধর্মঘট করে, এবং সেই ধর্মঘটে হাজারিও শামিল হয়। ধর্মঘট একদিন মিটেও যায়। সব রিকশা-ওয়ালার যে ভাগ্য হাজারিরও একদিন তাই হয়। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। ওরা তখন উঠে এসেছে এই আনন্দনগর বস্তিতে।

তৃতীয়াংশে ম্যাকস লোয়েবের কাহিনী। ফ্ল্যাশব্যাকে ওর প্রেমিকা সিলভিয়ার গল্পও আমরা শুনি যে সিলভিয়া কবিতা লেখে—যার ভালো-বাসার কাছে ম্যাক্‌স্ নিজেকে দায়বদ্ধ ভাবে। নিজের বাড়িতেই লেপার ক্লিনিক চালু করতে হয় লোয়েবকে, এবং প্রথম দিনই সে ৪৭৯ জন কুষ্ঠ-রোগীকে দেখে। প্রসঙ্গত এসে পড়ে কুষ্ঠরোগীদের কামতাড়নার কথা, বউ-বদলের কথা ও অন্যান্য অনুষঙ্গও। এর পরে আছে হিজড়েদের কাহিনী। যথেষ্ট যত্নে আর শ্রমে দোমিনিক ওদের জীবনযাত্রা, উপকথা, ওদের দুঃখ-বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোভাল্‌স্কির প্রতিবেশী হিজড়েরা প্রাথমিক অবিশ্বাস কাটিয়ে একদিন এই মানব-ব্রতীকে নিজেদের একজন করে নিল।

আমেরিকা থেকে এল ম্যাক্‌সের বিরাট ধনী বাবা। কিনে নিতে চাইল বস্তিটিকে। কিন্তু কোনো বিদেশীর পক্ষে কলকাতায় জমি কেনা সম্ভব নয়। ম্যাক্‌স প্রতি বুধবার নিজের পয়সায় ভাড়াকরা এক মিনিবাসে অন্যস্থদের নিয়ে চলে যায় এন্ট্রাইড ডেন ক্লিনিকে। একদিন ম্যাক্‌সের বাবা আরথারও রোগীদের সঙ্গে যায়। বস্তিতে আসা-যাওয়া করতে-করতে তারও উপলব্ধি হয়—ভয়ংকর কলকাতা তাকে জীবনের আশায় উদ্দীপিত হবার শিক্ষা দিয়েছে। অনেকদিন আর্তরোগীদের দেখাশোনা করে ম্যাক্‌স্ মিয়ামিতে ফিরে যায়।

একদিন কোভাল্‌স্কি ভারতবর্ষের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে যান—সেদিন সত্যিকারের 'পরমানন্দ' তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর জীবনের সব-চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি দিন হল—জন্মদিন, সন্ন্যাস নেবার দিন এবং এই দিনটি। আসলে এই দিনটি তাঁর এত-দিনকার সেবার স্বীকৃতি। তিনি কল-কাতার, ভারতবর্ষের একজন হয়ে গেলেন।

এই কাহিনীটি পড়তে-পড়তে প্রসঙ্গত লাওৎসের "রিক্‌শাওয়ালা" এবং ঝঁরি শারিয়েরে-এর "পাপিও" মনে পড়ে যাবে। তবে সে শুধু এই আখ্যা-নের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ পড়ার সময়ই। দোমিনিক লাপিয়ের যথেষ্ট পড়াশোনা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন। কলকাতার বস্তিতে ফুটপাথে যে জীবন নিত্য চলমান তারই বিশ্বাসযোগ্য দলিল এই গ্রন্থটি। যদিও মাঝে-মাঝে মননশীলতার চেয়ে আবেগময়তা প্রাধান্য পেয়েছে—সাহিত্যরচনার চেয়ে সাংবাদিক প্রতিবেদনরচনার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে, তবু গ্রন্থটির গ্রিয়পাঠ-যোগ্যতা থেকেই গেছে। বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ করেই লেখাটি রচিত বলে সম্ভবত দ্বিতীয় পাঠের অভিনিবেশ দাবি করে না। আগের কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, দোমিনিক চরিত্র রচনা করতে চান নি—চেয়েছেন চিত্র রচনা করতে এবং তাতে সফলও হয়েছেন। দোমিনিকের পক্ষে আরেকটি কথাও নিবেদন করতে ইচ্ছে হয় : আমাদের দেশের দারিদ্র্যকে মূলধন করে তিনি কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়েছেন সত্যি, কিন্তু তার অনেকটাই তিনি বস্তিবাসীর সেবায় এবং কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষায় ব্যয় করতেও চেয়েছেন। এখানকার অনেক লেখক ও চলচ্চিত্রকারও তো দারিদ্র্যকে ব্যবহার করেছেন প্রিয় উপজীব্য হিসেবে। তাঁদের মধ্যেও এই সেবার মমতা এলে চমৎকার হত।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

হেনরি মূর

হেনরি মূর (১৮৯৮-১৯৮৬) মারা গেলেন। আগুন্ত রোদ্দার পরে পাশ্চাত্ত্যের শিল্পজগতে ভাস্কর হিসাবে এমন খ্যাতি আর কোনো শিল্পীর ভাগ্যে জোটে নি। রোদ্যাঁ, মাইঅল, বুর্দেল মনুষ্য-অবয়বকেন্দ্রিক দৃশ্যমান বহির্জগৎ-কেই ধ্রুব বলে মেনে ভাস্কর্যশিল্পের স্বরাজ্য বিস্তারে সার্থকতা অর্জন করে-ছিলেন। তাঁরা প্রাক্-আধুনিক ভাস্কর।

হেনরি মূর ছিলেন সেই প্রজন্মের ভাস্কর যাঁরা দৃশ্যমান বহির্জগতের বাইরে ভাস্কর্যের জগতের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলেন। সে-জগৎ সার্বভৌম, কিন্তু দৃশ্যমান বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য নয়।

অতপর, বহুঅনুষঙ্গবাহী দৃশ্যমান বহির্জগতের সঙ্গে স্বরাট-সার্বভৌম ভাস্কর্যের জগতের সম্পর্কের প্রসার ও গভীরতা ভাস্কর্যের ও স্রষ্টার অন্যতম পরিমাপক হিসাবে বিবেচিত হতে থাকল। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িকদের মধ্যে ব্রাঁকুসি, আর্কি-পেঙ্কো, লিপ্‌সিৎজ, ঝাদকিন, আর্প, জ্যাকোমেত্তি, তাৎলিন, গাবো, পেভস্-নার, হেপওয়ার্থ প্রমুখ উদ্ভাবনী-প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করেরা থাকা সত্ত্বেও কেন হেনরি মূরের প্রভাব সারা পৃথিবীতে এমন ব্যাপ্ত হল তার কারণ সম্ভবত তাঁর শিল্পভাবনার নিবিড় দৃশ্য-জগৎ-সম্পৃক্ততা।

শিল্পসৃজনে প্রেরণাজাত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এবং চিন্তন- ও- দক্ষতাজাত নির্মাণপ্রক্রিয়া অল্পবিস্তর মিলেমিশে থাকলেও কোনো-কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রেরণাজাত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, কোনো বা শিল্পীর ক্ষেত্রে চিন্তনজাত নির্মাণপ্রক্রিয়া, আবার কারও ক্ষেত্রে দক্ষতাজাত গড়নপ্রক্রিয়া চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। শিল্পবস্তুর শারীর-চারিত্র্য বিচার করে রসিক দর্শক চিনে নিতে পারেন কোন্ প্রক্রিয়া শিল্পীর মূল চালিকা-শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল।

শিল্পরসগ্রাহীতা হিসাবে নির্মিতি-উৎকর্ষ আমাদের চমকৃত করে, বিস্মিত করে, ভাবিত করে, শ্রদ্ধান্বিত করে। কিন্তু প্রেরণাদীপ্ত সৃষ্টি নির্মাণের দাপটকে সংযত না করলে রসিকমন

ভাস্কর্য

শিল্পরসে উল্লসিত হয় না, আবিষ্ট হয় না, মগ্ন হয় না। শিল্প, অভিধার্থে প্রাণ পায়—যখন প্রেরণা থাকে সৃষ্টির উৎসে।

প্রেরণাদীপ্ত শিল্প রূপকল্প-আশ্রয়ী। জাগতিক বস্তুরূপ প্রেরণার স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে সপ্রাণ কল্পরূপে পরিণত হয়। নির্মিত শিল্পে গঠন-গড়নের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অতিরিক্ত গুরুত্ব পায়। প্রেরণাদীপ্ত শিল্পীর আন্তঃ-প্রেরণার সঙ্গে বাইরের জগতের সাযুজ্যসাধনের যে দায় থাকে, নির্মিতিপ্রবণ শিল্পী তা থেকে মুক্ত (তাঁর ক্ষেত্রে দায় একমাত্র সংগতিপূর্ণ রূপনির্মাণ)।

হেনরি মূরের সমসাময়িক অধিক-তর উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন ভাস্কররা যখন নিবিষ্ট চিত্তে নির্মিতির সমস্যা সমা-ধানে নিমগ্ন, মূর তখন অনুভবের রূপ-কল্প সৃষ্টির তাগিদে অনুষঙ্গ-জায়ক বহির্জাগতিক রূপরাজ্য থেকে তাৎপর্য-ময় নির্যাস আহরণে উৎসুক। ছোট্ট একটি উদাহরণের সাহায্যে মূরের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ভাস্করদের তফাতটা বোঝানো যেতে পারে।

ভাস্কর্য-ভাষার অন্যতম মৌলিক উপাদান ঘন ত্রিতলমাত্রিক আকার। যন্ত্রসভ্যতামিথুন সন্ত্র-শিল্পী রুমানীয়-ফরাসি ভাস্কর কঁস্তাঁতিন ব্রাঁকুসি তাঁর সারাজীবন এমনই এক বিশুদ্ধ ঘন আকারের সন্ধানে ফিরেছিলেন যে-আকার স্বল্প রূপান্তরেই সব সচল, সজীব, সপ্রাণ মৌল-সত্তাকে শিল্প-বস্তুতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলবে। অণ্ড বা ডিমের আকারের মধ্যে তিনি সেই বিশুদ্ধ অবিভাজ্য ঘন আকারের সম্ভা-বনা লক্ষ করে গতিময় প্রাণের ধারণাকে তিনি ডিম্বাকৃতি নির্মিতিতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

ব্রাঁকুসির মতন মূরও প্রাণময় প্রকৃতির জায়ক-রূপের রূপগত চরিত্র-রহস্যসন্ধানী। কিন্তু জায়ন, বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা, মৃত্যুর রূপের যে বিচিত্র প্রকাশ প্রাকৃত-জগতে দেখা যায়, সম্পূর্ণ শরীরী সত্তায় প্রাণের প্রকাশ যেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকে কোনো ধারণাগত জ্যামিতিক সত্তায় পরিণত করতে মূর অপারগ ছিলেন। জলস্রোত, বারিধারা, হাওয়া, সময়ের প্রভাবে শিলার ক্ষয়-বৃদ্ধি থেকে তিনি প্রাণের ক্ষয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলেন আর সর্বকালের সব মানবমুখী শিল্পীর মতনই মনুষ্যাবয়বের ভিত্তিতে তাঁর ধ্যানের রূপকল্প গড়ে তোলেন। জন্ম-

বৃদ্ধি-ক্ষয়-জরা-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত প্রাণসম্পন্ন প্রকৃতি মনুষ্যাবয়বভিত্তিক রূপকল্পে রূপ পায়। প্রকৃতি আর মানুষ প্রাণচক্রে একীভূত হয়ে যায় হেনরি মূরের ভাস্কর্যে।

জাতিতে ইংরেজ, হেনরি মূরের জন্ম ১৮৯৮-এ। শিল্পের প্রাথমিক পাঠ জেন লীডস-এ। তার পরে লনডনে। ১৯২৫-এ স্কলারশিপ নিয়ে ফ্রান্স্ আর ইটালির মিউজিয়মগুলি দেখতে যান। লনডনের পাতাল রেলস্টেশনের জন্য তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ—"নরথ উইন্ড" সমাপন করেন ১৯২৮ (শিলার রূপচারিত্র্য গঠনে বায়ুর ভূমিকা মনুষ্যাবয়বভিত্তিক রূপকল্পে আভাসিত হল)। এর পরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ নরদাম্পটনের সেন্ট্ ম্যাথ্যুজ চার্চের জন্য করা "ম্যাডোনা অ্যানড দি চাইল্ড" (১৯৪৪)। মেরীমাতা যেন গর্ভ আর শিশু যেন ভ্রূণ; জন্মরহস্যের উন্মোচন কি এই ভাস্কর্যের লক্ষ্য! তার পর হল ডেভনশায়ারের ডার্টিংটন হল (এই সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা এলমহার্সট শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে গিয়ে শ্রীনিকেতনের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন)-এর জন্য "স্মারক স্তম্ভ" (১৯৪৫-৪৬)। যুদ্ধের সময়ে বিমান-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত সুড়ঙ্গ আশ্রয়ে আশ্রিত ভীত-সন্ত্রস্ত ঘুমন্ত, শায়িত, শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে অসংখ্য স্কেচ আর ড্রইং করেছিলেন মূর। তাতে সন্ত্রাস, মৃত্যু-ভয়, ক্ষয় এবং যৌথভাবে বাঁচার এক অদম্য ইচ্ছা রূপলাভ করেছিল। প্রথমে ডার্টিংটন হলের স্মারকস্তম্ভে তারই এক সংহত রূপ দেখতে পাই। মিশিগান-এর ব্লুমফিল্ড হিল-এর ক্রানব্রুক অ্যাকাডেমি অব আর্ট-এ (১৯৫৩-৫৪) কিংবা পারীর ইউনেস্কো-র সদর দপ্তরের জন্য করা (১৯৫৪) যে "ইন্টারনাল অ্যানড এক্স্টারনাল ফর্মস: রিক্লাইনিং ফিগার্স্ / স্টান্ডিং ফিগার্স্" নামে মূর্তিগুলি দেখা যায় সেগুলির উৎসও ওই জাতীয় ভাবনা। ১৯৪৮-এ ভেনিস-এর দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর প্রতিভা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

একাসনে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় প্রাণশক্তির প্রতিমা যিনি "কিং অ্যানড কুইন" (১৯৫২-৫৩)-এ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই হেনরি মূর তাঁর শারীরিক মৃত্যুর পরেও শিল্পের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকবেন।

প্রণবরঞ্জন রায়

গীতাঞ্জলি ও তার অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছিলেন—শুধু গীতাঞ্জলি বলাটা ঠিক হল না, কারণ ইংরেজি বইটিতে অন্য কাব্যগ্রন্থের কবিতার অনুবাদও আছে—তখন তাঁর মনে কী প্রেরণা করেছিল সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তখন তাঁর শরীর ভালো ছিল না, অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন, এই সময়ে জাহাজে যেতে-যেতে অনেকটা সময় কাটাবার জন্য তিনি নিজের কবিতা অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য এর আগে যে একেবারে অনুবাদ করেন নি এমন নয়, এর কোনো-কোনো কবিতা রবীন্দ্রনাথ বাঙলায় লিখে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অনুবাদ করেছেন। তবে এই সুস্থ হবার সময়টুকু এই অনুবাদ নিয়েই বেলা কেটেছে তাঁর, যার ফলে Song Offerings-এর মতো একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ এবং মূল রচনা—এই দুটিকে আমরা মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করে দেখছি যে, অনুবাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টা কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে একবার শেলির একটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। সেটিকে সংশোধন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন সৃষ্টি ঘটিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবির মতো "সংস্কারক"ও বাঙলা সাহিত্যে নেই। তবে সেসব আরো পরবর্তী কালের কথা। এখনকার আলোচনা আমরা গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ রাখব। কারণ, এইটিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বিশ্বের দরবারে হাজির করেছিল, এবং তার ফল কী হয়েছিল তাও আমরা জানি। জুলিয়াস সীজারের মতো তিনি এলেন, দেখলেন, এবং বিশ্ব জয় করলেন।

পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন, অন্য কেউ-কেউও করেছেন, কিন্তু তখন পটভূমিটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কবি তখন খ্যাতিলাভ করেছেন, যা লিখেছেন তাই তৎক্ষণাৎ ছাপা হয়ে যাচ্ছে, এজন্য অনেক সময়েই যেন যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি, এরকম

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

মনে হতে পারে। গীতাঞ্জলি অনুবাদের সময় কিন্তু অবস্থাটা এইরকম ছিল না। অনুবাদ কেমন হচ্ছে তা জানা নেই, কোনোদিন ছাপা হবে এমন ধারণাও করা হয় নি—সুতরাং অনুবাদটা কেবল ব্যক্তিগত শখ বা খেয়াল হিসেবে আরম্ভ হয়ে একটু-একটু করে নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এমনই বোধহয় ভেবে নেওয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শুধুমাত্র মৌলিক কবি নন, তিনি নিত্যপ্রসূও বটে। তাঁর পক্ষে অনুবাদে হাত দেওয়া একটু অপ্রত্যাশিত, কারণ সেকেনড হ্যানড জব-এ তাঁর উৎসাহ হওয়াটা অস্বাভাবিক। ছেলেবেলায় পাঠ্যাবস্থায় কিছু অনুবাদ তাঁকে করতে হয়েছে, ম্যাকবেথের অনুবাদ ওই সময়েই করা, তবু সাধারণভাবে এই কাজ তাঁর মেজাজের অনুকূল ছিল বলে মনে হয় না।

গীতাঞ্জলির অনুবাদ তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তো বটেই, বাঙলা সাহিত্যের পক্ষেও, এমন-কি সারা ভারতবর্ষের দিক থেকেও নিয়তির খেলা বলা চলে। কারণ, এরই ফলে বাঙলা সাহিত্যের দিগ্বিজয় শুরু হল, এবং পরাধীন দেশের এক কবি নোবেল প্রাইজ পেলেন।

আশ্চর্য! এত দিন পরেও একথা মনে না হয়ে পারে না যে ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ, তার স্বাধীনতা-আন্দোলনও তখন তেমন জোরদার হয় নি, বিদেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিশ্চয় ক্ষীণ। বিশেষ করে ইংল্যানডে ভারতবর্ষের যেটুকু পরিচিতি তখন আছে, তা হল রাজার কাছে প্রজার পরিচয়। এরোপ্লেন তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু নিয়মিত যাত্রী-বাহী বিমান চলাচল তখনো আরম্ভ হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধে বিমানের দ্রুত উন্নতি ঘটল, অর্থাৎ তার আগে বিদেশে যাতায়াত হত সাবেক জাহাজে। এক কথায়, ভারতবর্ষের খবর ইংল্যানডে পৌঁছবার উপায়টা ছিল মন্থর। আবার এও মনে করতে হবে, জাহাজের যাত্রা মৃদুগতিময় ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের কাজটি করে ওঠার অবকাশ পেয়েছিলেন। সুতরাং এই অন্তর যাত্রা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি সুযোগ হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে এও আশ্চর্যের যে রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংল্যানডের সুধীসমাজ তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। কেন তাঁরা এমন অভিভূত হয়েছিলেন? ইয়েটস

গীতাঞ্জলির ভূমিকায় তাঁর অনুভূতির কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন, অ্যান্‌ড্রুজ ওই কবিতা পড়ে বিনিদ্র নিশি-যাপন করেছিলেন, মে সিনক্লেয়ার অনুভব করেছিলেন এক দৈব উপস্থিতি। স্টারজ মুর তো সরাসরি রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন নোবেল কমিটির কাছে।

এক পরাধীন দেশের অপরিচিত কবির অনুবাদ নিয়ে যে আলোড়ন ঘটে গেল, তার জন্য অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। মূল রচনা বিদেশে কেউ পড়তে পারেন নি, তবুও তাঁরা যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন তার কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ওই বিদেশী মানুষের হৃদয়ের কাছে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। একটিও কঠিন শব্দ ছিল না, ছিল না কোনো দুরূহ চিত্রকল্প। ১৯১২ সালের ঘটনা এটি। ১৯১৪-তে শুরু হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপের মানুষ তখনকার রাজনৈতিক ঘটনার উত্থানপতনে বিমূঢ়, আতঙ্কিত। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সহজ এবং আনন্দময় জীবনের সংবাদ নিয়ে এল। ইয়েটস তাঁর ভূমিকাতে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেন একটি নতুন সভ্যতাকে দেখা গেল, কিন্তু নতুন হলেও সেখানে we have met our own images।

মূল বাঙলা যাদের মাতৃভাষা, এবং অবস্থাগতিকে যারা ইংরেজিও প্রায় বাঙলার মতোই শিখেছে, তাদের কাছে এই কৌতূহল জাগ্রত হতেই পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ কতটা মূলানুগ, বা মূলানুগ না হলে, কতটা সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ যে অনুবাদ করেছিলেন, তাতে মিল দেবার চেষ্টা করেন নি। অর্থাৎ পদ্যে নয়, গদ্যে ভাষান্তর করেছিলেন তিনি। এর আগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা তরজমা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আনন্দ কুমারস্বামী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, লোকেন পালিত। এঁরা সকলেই পদ্যে তরজমা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তা পছন্দ হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি গদ্যে তাঁর কবিতা অনুবাদ করুন। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য সে চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করলেন টানা গদ্যে। গদ্যে কাব্যের ভাবটা কেমন আসে, এ বিষয়ে হাডসনের *The Study of Poetry* থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যায় : When we speak of imagination and feeling…they may exist in what we should agree to call poetic prose … There is much poetry which is purely prosaic। এই প্রবন্ধেই হাডসন সাহায্য নিচ্ছেন কোলরিজের উক্তির : poetry of the highest kind may exist without metres এবং cites the writing of Plato and Jeremy Taylor as undeniable proofs of his assertions. এমন-কি এও বলা হল যে, Poetry need not be written in verse at all, the prose is good medium।

কোলরিজ যেমন প্লেটো এবং জেরেমির উদাহরণ দিয়েছেন, হাডসন হয়তো তেমনি রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দিতে পারতেন, যদি না তাঁর বইটি গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশের দু বছর আগেই বেরোত।

আবার বিপরীত মন্তব্য রয়েছে জেম্‌স্ মন্‌টগোমারির। তিনি বলেছেন, মিলটন বা শেকসপিয়রের কাব্য যদি গদ্যের মতো সাজানো হয় তবে দেখা যাবে যেন শিশিরকণা জড়ো হয়েছে, যেগুলো ঘাসের ডগাতে দেখায় মুক্তোর মতো, কিন্তু run into water in the hand।

তবু, গদ্যের কাব্য হয়ে উঠতে বাধা নেই, কারণ poetry is made out of life, belongs to life, exists for life। কবিতা তখনই মহৎ হয়ে ওঠে যখন সে "কেমন করে বাঁচব" এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ এই অর্থেই মহৎ। কারণ আমাদের নিতান্ত ছোটোখাটো সুখদুঃখ নিয়ে বাঁচার মন্ত্র সে উচ্চারণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ শুরু করলেন 'কোলাহল তো বারণ হল' কবিতা দিয়ে। কেমন হল সেই অনুবাদ ?

'কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে। এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে।'

এর অনুবাদ হল—

No more noisy, loud words from me—such is my Master's will. Henceforth I deal in whispers. The speech of my heart will be carried on in murmurings of a song—

অনুবাদটি মূল রচনার প্রায় কাছাকাছি গিয়েছে। "প্রায়"—কেননা Master's will-এর চিন্তাটা মূলে ছিল না।

'অলস বেলার খেলার সাথি এবার আমার হৃদয় টানে'—ইংরেজিতে হল it is the pleasure of my playmate of empty days, to draw my heart to him। এখানে কিন্তু 'সাথি' ব্যাপারটাই রইল, Master এল না, যদিও অলস বেলা বলতে empty days-এর পরিবর্তে idle hours হয়তো আরো সঠিক হত। সেদিক থেকে, শেষ পঙ্‌ক্তির 'বিনা কাজে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই বা জানে'—ইংরেজিতে I know not why is this sudden call to what useless consequence আরো বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে, কারণ 'বিনা কাজ' এখানে পূর্ণতর রূপ পেয়েছে useless এবং inconsequence, এই দুই কর্মহীনতায়।

I ask for a moment's indulgence কবিতাটি 'আমায় কেবল বসতে দিয়ো পাশে'-র অনুবাদ। এটিকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, ইংরেজিতে সব বলা হলেও, বাঙলা বাগ্‌ধারার ছন্দ অস্তহিত হলে যাঁরা বাঙলা জানেন তাঁদের পক্ষে তা অস্বস্তিকর হতে পারে। 'আজকে কেবল একান্তে আসীন / চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন, আজকে জীবন সমর্পণের গান গাব নীরব অবসরে'—ইংরেজিতে হয়েছে Now it is time to sit quiet face to face with thee and to sing dedication of life in this silent and overflowing leisure। 'চোখে চোখে' হয়েছে face to face, বাঙলায় with thee ছিল না (কার চোখে চেয়ে থাকা হবে, তা পরিষ্কার করে বলা হয় নি বলে বাঙলায় আবেদনটা বেশি)। 'জীবন সমর্পণ' বলতে যে রোমান্টিকতা জাগে, dedication of life-এ তা আসে না, অনেকটা যেন সেবাধর্মে উৎসর্গ বলে মনে হয়।

'প্রেমের হাতে ধরা দেব' কবিতাটিতে বাঙলা ভাষার সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে—যেমন, 'ডাকতে যারা এসেছিল, ফিরল তারা রোষে / প্রেমের হাতে ধরা দেব তাই রয়েছি বসে'। 'রোষে' এবং 'বসে', এই অন্ত্যমিলের মাঝখানে রয়েছে 'প্রেমের হাতে'—ওই প্রেম আছে বলেই 'রোষ' উপেক্ষা করেও 'বসে' থাকা যায়। ইংরেজিতে এই সূক্ষ্মতাটুকু অনুপস্থিত, তবু I am waiting for love পঙ্‌ক্তিটি কারো বুকে আলোড়ন তুলতে পারে। তা ছাড়া, waiting সার্থক হল কিনা বা হবে কিনা, এটি কবিতাটিতে স্পষ্ট নয়, যার ফলে এটি আরো হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বাঙলা এবং ইংরেজি প্রকরণ, দুটিতে এই মিলটুকু আছে।

'যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই'—গীতিমাল্যের এই কবিতাটির অনুবাদে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাঙলায় যেখানে রয়েছে 'সেই সুগন্ধ ফিরায় উদাসিয়া আমায় দেশে দেশান্তে'—ইংরেজিতে সেই দেশে দেশান্তে নেই, তার বদলে রয়েছে That vague sweetness made my heart ache with longing। সুগন্ধটা vague, হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় ব্যথিত। এই তফাতটুকু একটা নতুন মাত্রা এনে দেয়।

'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই' কবিতাটির অনুবাদে বাঙলাটিকেই অনুসরণ করা হয়েছে, অবশ্য ইংরেজি রূপটি বাঙলার চেয়ে মলিন, বোধহয় হুবহু নকল করতে হয়েছে বলেই—কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তিটি হঠাৎ বাঙলা রূপটিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, কারণ নকল না করে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'আমার ভালো তাই / চাহিতে যবে যাই, ভয় যে আসে মনোমাঝে'—ইংরেজিতে হয়েছে When I come to ask for my good, I quake in fear lest my prayer be granted। পাছে আমার প্রার্থনা মনজুর হয়ে যায়, সেই ভয়েই আমি কম্পিত, কারণ হয়তো ওই প্রার্থনার যোগ্য নই—এই কাঁপনটুকুই কবিতাকে মায়াময় করে তোলে।

'সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালোবাসে' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি 'তোমার খুশি চেয়ে আছে আমার খুশির আশে' অনুবাদে হয়েছে thy love for me still waits for my love। ইংরেজিটা এখানে বাঙলার তুলনায় জোলো—'খুশি' শব্দটাই একটা হাওয়া বইয়ে দেয়, সেই হাওয়ার রহস্য অনেক, ইংরেজিতে সরাসরি love বলে দেওয়ায় সেই রহস্যের ঘোমটাটুকু যেন সরে গেছে।

'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' হয়েছে In the deep shadow of the rainy July। এটি পড়েই বোঝা যায় যে বাঙলা ভাষার মিল এবং অনুপ্রাসের অভাবে ইংরেজি রূপটি কেমন বিধ্বস্ত। তবে সুখের কথা, কোনো অবাঙালি পাঠক সেটি ধরতে পারবেন না, এবং ইংরেজি চিত্রকল্পটিতেই খুশি হতে পারবেন।

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতার ইংরেজি রূপ Art thou abroad on this stormy night-এ মূলের সৌন্দর্য নেই। 'পরানসখা' শব্দের বোধহয় কোনো ইংরেজি হয় না, তা ছাড়া বাঙলা কবিতায় একটি অনিশ্চয়তা ছিল, যার ফলে উপভোগ্যতা ছিল বেশি। ইংরেজি কবিতার নিশ্চিত রহস্যময়তাকে মুছে নিয়েছে।

'সে যে পাশে এসে বসেছিল' কবিতাটির He came and sat by my side—এতে খানিকটা ছোটো আর ঘন করে নেওয়া হয়েছে তন্ত্রীগুলি। অনুবাদে এসেছে নতুন কারুকার্য। 'স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী'—এই পঙ্‌ক্তির আক্ষরিক অনুবাদ না করেও ভাবটি ধরা আছে, হয়তো খানিকটা নতুনত্বও এসেছে—my dreams became resonant with its melodies—এতে resonant শব্দটি স্বপ্নে-শোনা গানটিকে স্বপ্নের সুরেই মিলিয়ে নিতে পেরেছে। অবশ্য 'গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় পাগল করিয়া' পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ কেন হল না বলা যায় না। শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'মালার পরশ' বাদ দিয়ে আনা হয়েছে নতুন অনুষঙ্গ—breath। বাঙলাতে মালার পরশ বুকে লাগে নি বলে কবি দুঃখ করেছেন, ইংরেজিতে কিন্তু ছবিটা একটু ভিন্ন—Why do I ever miss his sight whose breath my sleep? বলতেই হবে, বাঙলা রূপটিই উন্নত। সেখানে মালার পরশ বুকে লাগে নি—এইটাই দুঃখ। ইংরেজিতে পাওয়াটা বেশি, অন্তত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাওয়া গেছে। বাঙলায় প্রাপ্তিটা কম বলেই আবেদনটা বেশি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যেভাবে অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া মতামত কিন্তু তা থেকে কখনো কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বাঙলা "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য", "নৈবেদ্য" বা "খেয়া"র কবিতা থেকে ইংরেজি অনুবাদগুলির প্রকরণগত পার্থক্য আছে। বাঙলার ছন্দমাধুর্য, শব্দানুপ্রাস, মধ্যমিল আর অন্ত্যমিলের চমক—কোনোটাই ইংরেজিতে নেই। ইংরেজির চেহারাটা সাদামাটা গদ্য, তার মধ্যে বাঙলা কবিতার ভাবটাই শুধু এসেছে, কবিতার অন্যান্য অংশ—যেগুলি কবিতার অন্যতম সৌন্দর্য—সেগুলির কোনোটাই রক্ষিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা চান নি। কিন্তু অনুবাদ সম্পর্কে কোথাও-কোথাও যখন কবি তাঁর মত জানিয়েছেন, দেখা যাবে সেটি কিঞ্চিৎ পৃথক। এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি উদ্ধৃত করি। এটি লেখা হয়েছিল নরেন্দ্র দেবকে। নরেন্দ্র দেবের "মেঘদূতে"র অনুবাদ পড়ে কবি লিখেছিলেন,

'হাল আমলে সংস্কৃত ভাষায় যখন কাব্যরচনা চলছিল তখন সে ভাষা চলতি ভাষা ছিল না।...সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যই যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধনু থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয়। চলতি বাংলার ছাঁদে যদি কাদম্বরীকে তরজমা কর তাহলে সে কাদম্বরীই থাকে না।...আমি হলে ছন্দাভাস দেওয়া গদ্যে সংস্কৃত ধ্বনি রেখে মেঘদূতের তরজমা করতুম।'

'গদ্য' কিন্তু 'ছন্দাভাস দেওয়া', এবং মূলের 'ধ্বনি রেখে'—তরজমা করার এই নীতি কবির গীতাঞ্জলি অনুবাদে অনুসৃত হয় নি। ১৯০৮ সালে লেখা কবির উপন্যাস "প্রজাপতির নির্বন্ধ"—যা ১৯২৬-এ "চিরকুমার সভা" নাটকে রূপান্তরিত হয়—তার মধ্যে কবি কিছু সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে ছন্দ এবং ধ্বনি বজায় রাখতে চেয়েছেন দেখা যাবে। এসব কবিতা অবশ্য গদ্যে লেখা হয় নি, মিল এবং মাত্রা দিয়েই লেখা। সংস্কৃত কবিতার বেলায় কবি যা করেছেন ১৯০৮ সালে, এবং ১৯২৯ সালের ওই চিঠিতে এ বিষয়ে যে মতামত দিয়েছেন, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদে তা মানা হয় নি। বরং পরবর্তী কালে এই ইংরেজি অনুবাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে খুশিমনেই জে. ডি. এনডারসনকে লিখেছেন,

It was the want of mastery in your language which originally prevented me from trying English metres in my translation. The clearness, strength, and the suggestive music of well-balanced English sentences make it a delightful task for me to mould my Bengali poems into English prose form. I think one should frankly give up the attempt at reproducing in a translation the lyrical suggestions of the original verse and substitute in their place some new quality inherent in the new vehicle of expression.

১৯১৮ সালের এই চিঠি থেকে এইটাই দাঁড়ায় যে ইংরেজি কবি ভালো জানেন না (want of mastery) বলেই গদ্যে লিখেছেন, অপর দিকে সংস্কৃত ভাষা তিনি তাঁর পরিবেশেই পেয়েছিলেন। গদ্যে অনুবাদ করতে গিয়ে কবি কাজটার অন্তর্নিহিত নতুন সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন (inherent new quality), যেজন্য এতে তিনি যথেষ্ট খুশি—In English prose there is a magic which is original again in a different manner. Therefore it not only satisfies me, but gives delight to assist my poems in their English rebirth.

ইংরেজিতে তাঁর কাব্যের জন্মান্তর দেখে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, অনেক জায়গাতেই গীতাঞ্জলির কবিতার পুনর্জন্ম ঘটেছে, বা সব সময়ে অতটা না হলেও' নতুন মাত্রার যোজনা হয়েছে—খুলে গেছে নতুন দিগন্ত, উন্মোচিত হয়েছে নতুন দৃশ্য। সেইজন্যই, বাঙালি পাঠকের কাছেও ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনেক অংশ উজ্জ্বলতর মনে হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর An Acre of Green Grass-এ লিখেছিলেন Gitanjali is a miracle of translation. The miracle is not that so much has survived, but the poems are re-born in the process....There are moments when the translation surpasses the original.

অবাঙালি পাঠকের কাছে এইসব কবিতার সারল্য এবং মাধুর্য হবে হৃদয়ভেদী। একদিক থেকে, রবীন্দ্রনাথের সুবিধাও ছিল। তিনি অনুবাদ করতে বসেছিলেন নিজেরই কবিতা। তার ফলে, ভাষান্তর করবার সময়ে তিনি অনায়াসে স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ইংরেজিতে তাঁর কবিতাকে দিতে পেরেছিলেন নতুন চেহারা। টমসন বলেছিলেন, ইংরেজি গীতাঞ্জলি একটি নতুন কাব্য। সেটি সত্য কথা। কবি যে তাঁর কবিতাকে সব সময়ে অবিকল অনুবাদ করতে যান নি, কিছু-কিছু বদল ঘটিয়ে দিয়েছেন, তাতে দেখা গেছে যে, বাঙলায় যে কবিতাটি ততটা সবল নয়, ইংরেজিতে সেটি অনেক মূল্যবান হয়ে উঠেছে। বাঙলায় আবার যেটি ভাষা বা ছন্দের অভিঘাতে আমাদের অধিকার করে, ইংরেজিতে সেই ভাষা বা ছন্দের অভাবে দুর্বল লাগে, অথচ নতুন শব্দযোজনায় ভাবের উন্নতিও ঘটে যায়। ইংরেজি গদ্যের সাবলীলতায় বাঙলা সাধারণ কবিতার অসাধারণ উত্তরণ ঘটে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, গীতাঞ্জলির কবিতা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হলেও, এদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতই স্পষ্ট। ঈশ্বরানুভূতির কবিতার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তাপ সঞ্চারিত। ইয়েটস এই বইয়ের ভূমিকায় সেই কথাই বলেছেন: Lovers, while they await one another, shall find in murmuring them, this love of God a magic gulf wherein their own passion may bathe and renew its youth। কেমন করে এই অঘটন ঘটল, কিসের জাদুতে ঈশ্বরভক্তি আর নরনারীর প্রেম একাকার হয়ে গেল, তারই উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে গীতাঞ্জলির দিগ্বিজয়ের কারণ। একটিও কঠিন শব্দ উচ্চারণ না করে, সরল ভঙ্গিতে আত্মনিবেদনের সুরটি মানুষের হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রকাশ হয়ে দাঁড়াল। কোনো কবিতাই মনে হচ্ছে না যে আমার চেয়ে দূরের কাউকে বলা হচ্ছে, বরং অনেক সময়েই মনে হয়, এগুলি কাউকে কানে-কানে শোনানো চলে। সোদক থেকে, রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি প্রথম অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেটি যেন নিয়তনির্দিষ্ট। 'কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে'—হয়তো কিছুই না ভেবে এটিকে প্রথম তুলে নেওয়া হয়েছিল। তবু এরই মধ্যে কবি তাঁর প্রাণের আলাপের নির্যাসটুকু ছেঁকে তুলে দিয়েছিলেন। ইউরোপের কানে ভারতের প্রীতিপূর্ণ আলাপ এইভাবেই পৌঁছে গিয়েছিল।

গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির মধ্যে প্রায়শই দুর্বল, পরাজিত মানুষের হৃদয়কে দেখতে পাওয়া যায়। এদের জয়যাত্রার এটি একটি বড়ো কারণ। মানুষের ভীরুতা, তার দ্বিধা এইসব কবিতার মধ্যে সংসা মহীয়ান হয়ে উঠেছে। মানুষের দীনতা হঠাৎ মূল্যবান হতে পেরেছে। খেয়ার "প্রচ্ছন্ন" কবিতাটির অনুবাদ হল ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৪১-সংখ্যক কবিতা। 'কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়'—অনুবাদে এটি মোটামুটি অনুসৃত হয়েছে। কেবল 'আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব তারে দিব বিসর্জন'—এই পঙ্‌ক্তিটি ইংরেজিতে একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে—How could I utter for shame that I keep for my dowry this poverty। বাঙলাতে বক্তব্যটি ছিল নিশ্চিত এবং ঋজু, ইংরেজিতে কিন্তু কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে, উচ্চারণ করে উঠতে হচ্ছে সংকোচ। dowry হিসাবে poverty সম্পূর্ণ নতুন, এবং বলতে দ্বিধা নেই, বাঙলার 'রাজৈশ্বর্যে দৈন্য বিসর্জনে'র চেয়ে অনেক বেশি রোমান্টিক। পঙ্‌ক্তিটির বিন্যাসে I keep this poverty for my dowry হলে হয়তো বেশি গদ্যানুগ হত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে গদ্যে অনুবাদ করতে বসলেও রবীন্দ্রনাথ পদ্যের মায়া একেবারে কাটাতে পারেন নি।

'একলা আমি বাহির হলেম' কবিতাটির অনুবাদে মূল বাঙলাকে যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। কেবল শেষ

অংশে 'সে যে আমার আমি প্রভু'-র অনুবাদে He is my own little self বলায় বক্তব্যটা একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে গেছে; বাঙলায় শুধু 'আমার আমি', ইংরেজিতে সেই আমিকে little self বলে আমিত্বের মানটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা হল। অন্য দিকে, 'আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে'র ইংরেজি রূপটি The day is no more বাঙলা থেকে উন্নত হয়েছে একটি পঙ্‌ক্তিতে। 'ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়ার সঙ্গে The wind is up, the ripples are rampant in the river মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে 'প্রেমনদী' না বলে শুধু river বলায় বক্তব্যটি অনেক সম্ভাবনাময়, এবং তারই জন্য পরবর্তী স্তবকে 'অজানা'র অনুবাদে সরাসরি unknown man বলায় কবিতাটি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতে পেরেছে। 'প্রেমনদী' কথাটি বড়ো বেশি স্পষ্ট, কবিতার প্রাণ বা আত্মা কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা দাবি করে যাতে কাব্য আরো মোহময় হতে পারে। ইংরেজিতে সেই অস্পষ্টতা আছে।

খেয়ার "আগমন" কবিতাটি অনুবাদে হুবহু অনুসরণ করেছেন, তবু সামান্য দু-একটি পার্থক্য আছে। সে দুটি অবশ্য ইংরেজ পাঠকের কাছে বড়ো আকারে গ্রাহ্য হবার মতো নয়, তবু তফাতটুকুতে কবিতার মৌল পরিবর্তন ঘটে গিয়ে জোরটুকু কমে যায়। দ্বিতীয় স্তবকে 'দূত এল বা তবে' অনুবাদে হল It is the messenger। এতটা নিশ্চয়তা অপ্রয়োজনীয়, বরং একটু দ্বিধা থাকাই ভালো ছিল। সেদিক থেকে 'তবে' অর্থে 'may be' হলেই ভালো হত। শেষ স্তবকে 'দুয়ার খুলে দে রে বাজা শঙ্খ বাজা' আর 'open the doors, let the conch-shells be sounded এক নয়। 'বাজাও' এবং 'বাজানো হোক'—এ দুয়ের তফাত কাউকে বলে দিতে হবে না।

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে' কবিতাটি খুবই বিশিষ্ট। আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেও তোমাকে আনা হয় নি, তোমাকে পাওয়া হয় নি—এই বেদনাটুকু এই আশ্চর্য কবিতায় বিধৃত। এই 'তোমাকে' যে কে, তার উত্তরে এক কথায় ঈশ্বর বলে দেওয়া সম্ভব, কারণ ওই 'প্রভু' শব্দটির প্রয়োগ। কিন্তু কবিতাটি পড়ে পুরোনো প্রেমের স্মৃতিবেদনাই গুঞ্জিত হয়ে ওঠে। 'যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে / তবু তোমায় ঘরে হয় নি আনা, একথা রয় মনে'—এর মধ্যে যে নিত্যবহ ক্ষোভ সঞ্চারিত, তার সুরে অপৌরুষেয় ঈশ্বরের পরিবর্তে কোনো শরীরী মানবীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। সেইজন্যই কবিতাটির আবেদন এত দুর্বার। ইংরেজিতে সব রক্ষিত হলেও, let me feel that I have not invited thee to my house-এ মূলের মৌলিক বেদনা অন্তর্হিত। 'তোমায় ঘরে আনি নি' আর 'তোমায় নিমন্ত্রণ করি নি'—এ দুয়ে আসমান-জমিন ফারাক। একটায় সমস্ত অন্তর হাহাকার করে উঠেছে, অন্যটায় রয়েছে একটি সৌজন্যের প্রকাশমাত্র।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যেমনই হয়ে থাকুক, অর্থাৎ বাঙালি পাঠকের কানে তার উন্নতি বা অবনতি যেটুকুই ধরা পড়ুক, একথা স্বীকার করতেই হবে, স্বতন্ত্রভাবে এই অনুবাদের মূল্য অপরিসীম। কারণ বিষয়বস্তুর গাঢ়তা এবং প্রকাশের অনায়াস কৌশল এদের তৎক্ষণাৎ জয়ী করে দেয়। ঠিক এইটিই ঘটেছিল গীতাঞ্জলির অনুবাদ আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে। কেমন অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল এই জয়যাত্রা, তার একটি প্রাসঙ্গিক কাহিনী দিয়ে শেষ করতে চাই। কাহিনীটি অজানা নয়, তবু আরো একবার শুনলে নতুন করে সেই সময়ের পটভূমিকে বুঝতে পারা যাবে।

ইংরেজ তরুণ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের মৃত্যু ঘটেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর মা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আমার ছেলের দিনপঞ্জীতে আপনার কবিতার দু লাইন লেখা ছিল। সেটি বুকে নিয়েই সে মৃত্যুকে বরণ করেছে। আপনি কি আমায় জানাবেন, আপনার ওই কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে কোন্ গ্রন্থে আছে?'

গ্রন্থটি Song Offerings। কবিতাটি বাঙলায় হল 'যাবার বেলা এই কথাটি বলে যেন যাই / যা পেয়েছি, যা দেখেছি তুলনা তার নাই।'

ইংরেজিতে এটি হয়েছিল When I go from hence let this be my parting words that what I have seen is unsurpassable।

'যা পেয়েছি'র ইংরেজি করা হয় নি, কেবল 'যা দেখেছি' এবং সেটুকুর 'তুলনা নাই'—unsurpassable।

ইংরেজি এবং বাঙলা—দুটিই এখানে অপরূপ। জীবনের এই কবিতা বিদেশী কবির মৃত্যুর সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

পিনাকী ভাদুড়ী

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন

দেবীপদ ভট্টাচার্য

তাঁর চিঠি পেলাম ১৮ই সেপ্টেম্বর। জরুরি ব্যক্তিগত কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য যেতে লিখেছেন। তারপর আরো লিখেছেন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত সুকুমার রায়ের কবিতার ছন্দ-শিল্প সম্পর্কিত দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়তে। চিঠিতে কোথাও অসুস্থতার নাম-গন্ধ নেই। লিখলাম, ১৯শে আকাশবাণীতে আমার একটি কথিকার 'আমার কালের অধ্যাপকেরা' রেকর্ডিং হবে, প্রচারিত হবে ২৯শে সেপ্টেমবর রাত আটটায়। এই কথিকাটি তিনি যেন শোনেন। আমি তার পূর্বেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। ২০শে তারিখ সকাল ৯.২৫ মিনিটে শান্তিনিকেতন থেকে আমার বন্ধু নরেশ গুহ ট্রাঙ্ককলে জানালেন ঐ দিন ভোরে কাউকে কিছু না বলে ঘুমের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন চলে গেছেন। আর পূর্বদিন-রচিত তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে লিখে গেছেন—

> প্রচলিত প্রথায় আমার যেন মুখাগ্নি করা না হয়। 'মুখাগ্নি' মানে প্রথম অগ্নিসংযোগ, মুখে আগুন দেওয়া নয়। দেবীপদকে আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মেনে নিয়েছি। সে-ই প্রথম অগ্নিসংযোগ করতে পারে।

আমাকে তিনি তাঁর 'জ্যেষ্ঠপুত্র' বলে গ্রহণ করেছিলেন, এর চেয়ে বড়ো মর্যাদা একজন ছাত্রের জীবনে আর কী হতে পারে! পনের বছর পূর্বে বিজয়ার পর তিনি আমাকে লিখেছিলেন—

> তোমার সমস্ত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হক, তুমি দেশের গৌরব বৃদ্ধি কর, আমাদের গর্বের স্থল হও—এই আশীর্বাদ তোমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকুক।...পূজার সময় তোমাদের দেওয়া কাপড়ই পরেছি প্রথম দিন। বড় ছেলেরই অগ্রাধিকার—তার অন্যথা করিনি কোনোদিন, করবও না। আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও তোমারই অগ্রাধিকার থাকবে—আমার মনের চিরপোষিত এই বাসনাটিও তোমাকে জানিয়ে রাখলাম এখনই। (শান্তিনিকেতন, 'রুচিরা', ৭. ১০. ৭১)

আমি যে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম এর চেয়ে বড়ো পুণ্য কর্ম আর কী হতে পারে! কিন্তু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বিবৃত ও বিস্তারিত করে বেশি লাভ নেই। কোন্ কোন্ গুণে তিনি অ-সাধারণ ছিলেন, বরংচ সেই দিকগুলির কথা নিয়ে কিছু আলোচনা হওয়া ভালো।

প্রবোধচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৭ সালে ১৫ বৈশাখে তখনকার ত্রিপুরা, বর্তমানের কুমিল্লা জেলার চুঁটা নামের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। তাঁর পিতা হরদাস সেন, মাতা স্বর্ণময়ী। তাঁর জন্মের কয়েকবছর পূর্বে ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তিদের মহাপ্রয়াণ। এঁদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশাচার-বিরোধিতা, যুক্তিবাদী দৃষ্টি, শাস্ত্রকে নতুন আলোকে বিচার, সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়ন ও প্রবল মানবহিতৈষা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা, মানব-ধর্মিতা, স্বদেশপ্রীতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চা, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধার তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল। তাঁর জীবনে এঁরা তিনজনই

স্মরণে

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁর জন্মের চার বৎসর পূর্বে (১৮৯৩) স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে এক দৃপ্তভাষণ দান করেন। স্বামীজির তিরোধানকালে প্রবোধচন্দ্রের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। কৈশোরকালে স্বামীজির স্বদেশচিন্তা, শক্তিচর্চা, কর্মযোগ, কুসংস্কারবিরোধিতা, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও নরসেবার ব্রতগ্রহণের আহ্বান তাঁকে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধানত করেছিল। উনিশের শতকের নবজাগরণবাহী যে ধারাটি যুক্তিবাদকে, বিচারনিষ্ঠ দৃষ্টিকে গ্রহণ করেছিল প্রবোধচন্দ্র তারই বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। উনিশের শতকের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বেকন, হিউম, কোঁতের ভক্ত ছিলেন, স্পেনসার ও ডারউইনের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই 'রিজন্'কে ছেড়ে 'ফেইথ্'কে, 'যুক্তি'কে ছেড়ে বিচারহীন 'ভক্তি'কে বড়ো করে দেখেছিলেন। সেজন্য 'নব্যহিন্দু' 'নব্যবৈষ্ণব' 'থিয়সফি' 'তন্ত্রের নব ব্যাখ্যা' প্রভৃতি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, অর্থাৎ 'রিজন'-এর জায়গায় এল 'অ্যাণ্টি-রিজন'। প্রবোধচন্দ্র যুক্তিবিজ্ঞানের দর্শনকে তথা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধকে জীবনে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি'।—গায়ত্রীমন্ত্রের এই 'ধী'কেই তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে-

ছিলেন। সেজন্য তিনি চাইতেন বিচারহীন ভাব-বিহ্বলতা যেন কখনো আমাদের মনের প্রশ্রয় না পায়। এই যুক্তিবাদী মনকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি রক্ষা করে গেছেন, যখন আমাদের দেশের চারদিক ধর্মব্যবসায়ীদের বিচারহীন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উদ্‌বেলিত তিনি মনে করতেন বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম যা একদা যাগযজ্ঞের বা পশুঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল, পরবর্তী কালে ভক্তির প্রাবল্যে যে বলিষ্ঠতা ভেসে গিয়েছিল। অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল যীশু খৃষ্ট-প্রচারিত খৃষ্টধর্মে ও চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে। সেজন্য 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে। মুহূর্তে বিহ্বল হয়' সেই ভক্তি-বিহ্বলতা জাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

দ্ব্যর্থহীন যুক্তিবাদী মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি পরলোক, ঈশ্বর, মোক্ষ, কর্মফল কোনোটিতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। সেজন্যেই তিনি আত্মার অবিনাশিতা, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সংযোগ—এই ধরনের তত্ত্বে আস্থা রাখেননি। পারলৌকিক শ্রাদ্ধশান্তি দূরের কথা, তাঁর স্মরণসভায় 'আধ্যাত্মিক' সংগীত পরিবেষণ পর্যন্ত নিষেধ করে গেছেন তাঁর শেষ 'ইচ্ছাপত্রে'। সেজন্য নির্দেশ রেখে গেছেন—'আমার শবদেহের কোনো ছবি যেন তোলা না হয় আর দাহসমাপ্তির পরে যেন সামান্যতম ভস্মাবশেষও রাখা না হয়।' যে-বিশ্বাস তিনি ঈশ্বরে রাখতে পারেননি, সে-বিশ্বাস তিনি রেখেছেন মানুষের 'পর। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'জ্যাঠামশায়' জগমোহনের মতো তিনি মনে করতেন নাস্তিক বলে তাঁকে আরো খাঁটি হতে হবে। জগমোহনের মতো চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আর আঁকেননি। 'ধর্মমোহ' (১৯২৬) কবিতায় ('শিশুশেষ') রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

প্রবোধচন্দ্রের কাছে এই কথাগুলি ছিল বড়ো সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের পর তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা হন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৮) বইটি পড়লে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

প্রবোধচন্দ্র 'বঙ্গভঙ্গবিরোধী' আন্দোলন বা 'স্বদেশী' আন্দোলনের (১৯০৫) শুরু হবার সময়কে তাঁর 'দ্বিতীয় জন্ম' বলেছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বৎসর। সেদিন ১৯০৪-এর ১৬ অক্টোবর যে আবৃত্তি করেছিলেম 'বাংলার মাটি বাংলার জল', সারা জীবন দেশাত্মবোধের সেই পবিত্র অগ্নি তাঁর হৃদয়ে দীপ্যমান ছিল। ছাত্রজীবনে বিপ্লবী অনুশীলন' দলে সক্রিয়ভাবে যোগদানের ফলে তাঁকে বহু দুঃখবরণ করতে হয়েছে কিন্তু 'নির্ধাতন লয়েছে, সে বক্ষ পাতি'। পরে তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসের বরিশাল অধিবেশনে যোগ দেন কংগ্রেসকর্মী-রূপে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসেও যোগ দেন। এই অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। পরবর্তী কালেও গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর পিছনে ঘুরেছে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য যে স্বর্ণপদকগুলি পেয়েছিলেন সেগুলি যুদ্ধসাহায্যভাণ্ডারে দান করেন। তার একটিমাত্র কারণ স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। সেজন্যই নির্দেশ দিয়ে গেছেন মৃত্যুর পর তাঁর ললাটে চন্দনের বদলে যেন দেশের মাটি লেপে দেওয়া হয়।

অধ্যাপকরূপে তিনি আমাদের কাছে আদর্শস্থানীয় ছিলেন পাণ্ডিত্যে ও চারিত্রে। বাংলাসাহিত্য এবং ইতিহাস ক্লাশে পড়ালেও তিনি চাইতেন সেই পন্থা যাকে এখন বলা হয় 'ইন্‌টার-ডিসিপ্লিনারি'। তিনি তাঁর ছাত্রদের এই পথে সর্বদা হাঁটতে বলতেন। নিজের বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মনে করতেন না। তাঁর রচিত 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' (১৯৭৮) গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি লিখেছেন—

আমি সর্বত্রই ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তথ্য ও যুক্তির সহায়তায় স্বাধীন ভাবে বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আমার সিদ্ধান্তও কেউ নির্বিচারে গ্রহণ করুন তা আমি চাই না। নিত্য বিচার ও পুনর্বিচারই সত্য নিরূপণের একমাত্র পথ বলে আমি বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, সত্যের প্রকৃতিও কালে কালে বিবর্তিত হয়। কালাতীত নিত্যসত্য কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান।

জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর অকৃপণ স্নেহ সকলের উপর বর্ষিত হত। সকলকে নিয়ে তিনি খেতেন। তবে যেসব ছাত্র ন্যাকামি বা জ্যাঠামি করত (প্রবোধচন্দ্র বলতেন 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব') তাদের তিনি ঘোর অপছন্দ করতেন। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে

তিনি লিখেছেন—

যে শিক্ষক ছাত্রকে স্নেহ করেন না, মিত্ররূপে গ্রহণ করেন না, তাঁকে শিক্ষকই বলা যায় না। আর যে ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না, হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে না সেও ছাত্র নামের অযোগ্য।···শিক্ষানীতির আর-একটি আদর্শ হচ্ছে—শিষ্যাৎ পরাজয়ম্ ইচ্ছেৎ। গুরুকে ছাড়িয়ে যাওয়াতেই শিক্ষার সার্থকতা। নতুবা জ্ঞানের অগ্রগতি হবে কেমন করে? শিষ্যের এই অগ্রগামিতাই হওয়া উচিত গুরুর কাম্য, কেননা তাতেই সূচিত হয় তার শিক্ষাব্রতের সার্থক পরিণতি। [রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা]

সাম্প্রতিক কালের শিক্ষাজগতে যে প্রতিবোধহীন অরাজকতা চলছে তার পটভূমিকায় এই শিরোধার্য কথাগুলি হয়তো অর্থহীন শোনাবে। অনেকে বলবেন তিনি 'ওল্‌ড ভ্যালুজে'র মানুষ ছিলেন। কিন্তু মূল্যবোধ অতীতবাহী হলেই তার মূল্য হারায় না। সর্বাত্মক শ্রদ্ধাহীনতা কোনো কালেই মূল্যবোধ বলে গণ্য হয় না, যেমন প্রথাগত অন্ধভক্তি কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না। 'আদর্শবাদ' কথাটি এখন পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে কিন্তু মনে রাখতে হয় 'আদর্শ'কে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবল 'সুযোগবাদ' গ্রহণ কোনো জাতিকে বড়ো করে না। বিশেষ করে যুবশক্তির এ কথাটি মনে রাখা দরকার। 'মূল্যবোধ' নিজে বহন না করলে সমাজে তার কোনো মূল্য নেই। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়', চৈতন্যদেবের এই কথাটি অবশ্যমান্য। তাই অহিংসামন্ত্রের সাধক গান্ধীজি বলতে পারেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'। প্রবোধচন্দ্র জীবনে কোনো উদ্ধত অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করেন নি—প্রচণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ পুলিশতন্ত্র থেকে বিশ্বভারতীতন্ত্র অবধি তিনিই বলতে পারেন—'ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট / আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল'। সম্বলহীন অবস্থায় আত্মমর্যাদাকেই একমাত্র সম্বল বলে মনে করেছেন। এক কন্যার বিবাহের সময় নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলবার সুযোগ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেননি। কিন্তু বিবাহ বন্ধ হয়নি। অতি তুচ্ছ টেকনিক্যাল কারণ তুলে তাঁর পেনসন আটকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি কারো বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেন নি।

তিনি জীবনে 'ধী'-কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন সত্য, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 'শ্রী'-কে। এই 'ধী' ও 'শ্রী'র সুষ্ঠু সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল। পরিচ্ছদ বেশভূষার (সে জীর্ণ হোক ক্ষতি নেই) তিনি পক্ষপাতী, বিলাসিতার তিনি বিশেষ বিরোধী ছিলেন। গৃহসজ্জায়, অতিথি-আপ্যায়নে, উপহার-প্রদানে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় সেই সংযত শ্রীর প্রকাশ ঘটত। তিনি যে কাগজে লিখতেন সেগুলি সযত্নে সমান মাপে কাটা, সমান মার্জিন, প্রথম পাণ্ডুলিপি হলেও কাটাকুটির সংখ্যা নগণ্য, পংক্তির মধ্যে ফাঁক একই মাত্রার। আসলে তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র, ইচ্ছাও ছিল উচ্চশিক্ষা নেবেন অঙ্কশাস্ত্রে। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্ভব না হলেও, জীবন ও চিন্তাকে বেঁধেছিলেন গণিতের নিয়মিত শৃঙ্খলায়। অঙ্কশাস্ত্রের এই সুষ্মশৃঙ্খলা তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর ছন্দ-চিন্তায়। তাই বাঙলা ছন্দের বিশ্লেষণে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হল প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায়।

প্রবোধচন্দ্রের বিবাহ হয় তাঁর আঠাশ বৎসরে বয়সে, তাঁর সহধর্মিণী রুচিরা দেবীর বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। তিনি আদর্শ পত্নী, গৃহিণী ও জননী। সংসারসমুদ্রে প্রবোধচন্দ্র যে দিক্‌ভ্রষ্ট হননি তার প্রধান কৃতিত্ব তাঁর পত্নীর। তিনি যে সুদীর্ঘকাল তাঁর কর্মী-জীবন ও লেখক-জীবন উভয়কে চালনা করতে পেরেছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে রুচিরা দেবীর শ্রান্তিক্লান্তিহীন পরিচর্যার ফলে। প্রবোধচন্দ্রের সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তিনি মাতৃস্বরূপা।

প্রবোধচন্দ্রের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় দিক হাস্য-কৌতুক সৃষ্টি, নির্দোষ আনন্দের খেলা। শিশুদের নিয়ে খেলতেন ধাঁধার খেলা, বড়দের সঙ্গে 'উইট' ও 'পান্', বুদ্ধি ও কৌতুক মিশিয়ে যাদের সৃষ্টি। এই কৌতুকরস তাঁর জীবনকে রৌদ্রময় করে রেখেছিল। একবার আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

আমার দেহ আজকাল বড় অবাধ্য হয়েছে। দেহটাকে 'ডিভোর্স' করাই স্থির করেছি। শোধরাবার আশা দেখছি না। আগেকার দিনের ধর্মরাজরা পত্নীত্যাগে দ্বিধা করতেন না। আমার পক্ষেও অবাধ্য তনুত্যাগে অধর্মের ভয় নেই। তনুত্যাগ সম্ভব না হলে প্রাণত্যাগ করা যাবে তো। আমার মতো ত্যাগব্রতী মানুষের পক্ষে কোনোটাতেই আপত্তি নেই। (২৮. ১০. ১৯৭৫)

এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকসৃষ্টিতে তাঁর 'বিলাস' ছিল।

জীবনকে তিনি সহজ সুন্দর রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাধাবিঘ্ন, অপ্রত্যাশিত আঘাত, মর্মান্তিক বেদনা সবকিছুকে তিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন। আমার সঙ্গে

তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের পরিচয়। তার মধ্যে মাত্র তিন-বার তাঁকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি নীরবে। শোককে জয় করবার জন্য সর্বক্ষণ কর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর অধ্যয়নস্পৃহা প্রবল ছিল, সেজন্য ইতিহাস, সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞানের নানা শাখার বই পড়তেন। তবে তিনি বিজ্ঞান-পাঠক মাত্র ছিলেন না, বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র ছাত্র ছিলেন, অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার কাছে অশোকানুশাসন অধ্যয়ন করেছিলেন। 'ধর্ম-বিজয়ী অশোক' (১৯৪৭) বইটি তারই ফল। ভূমিকায় বড়ুয়া লিখেছেন—

> ঐতিহাসিকের প্রধানত দেখা উচিত আদর্শবাদী অশোকের ধর্মনীতি ও ধর্মবিজয়পদ্ধতি ভারতসভ্যতা ও মানবসভ্যতার গতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুখের বিষয় প্রবোধচন্দ্র এর সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা ও গবেষণা আজ অবধি হয়নি।

অশোকানুশাসন পড়তে গিয়ে তিনি বুদ্ধনীতি তথা বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বুদ্ধজন্মোৎসব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন পাশ হবার পর যে সাধারণ নির্বাচন হয় সেখানে ভোটার তালিকায় 'ধর্মের' কলামে তিনি 'হিন্দু' লিখতে অস্বীকার করেন। আমাকে ১৯৩৮ সালে বলেন 'লিখতেই যদি হয়, আমি নিজেকে 'বৌদ্ধ' লিখব।' বুদ্ধবচনভিত্তিক 'ধম্মপদ-পরিচয়' বইটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার 'মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি'। উপনিষৎ, গীতা ও ধম্মপদের মধ্যে কোথায় কোথায় মিল সেটি তিনি অভ্রান্তরূপে নির্দেশ করেছেন। বাঙালির বুদ্ধচিন্তা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি নিয়ে তিনিই প্রথম ব্যাপক ও গভীর চর্চা করেন, পরে তাঁর গবেষকছাত্র সুধাংশুবিমল বড়ুয়াকে দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি' নামে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করান।

যেমন পালি, তেমন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। স্কুলে নীচের ক্লাশে পড়বার সময় তিনি একদিন 'ঘাস' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বলতে পারেননি। অন্য একটি ছেলে পেরেছিল। সেইদিন থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে লাগলেন। পরে পাণিনি-ব্যাকরণ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অন্যদিকে তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল দুই কোটির—একদিকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', অপরদিকে কালিদাসের কাব্য-নাটক। ইতিহাসের তথ্য আর সাহিত্যের সত্য, দুটিকেই তিনি মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কালিদাসের কাব্য-নাটকে কীভাবে প্রাচীন ভারত কথা বলে উঠেছে, আজকের ভারতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদে'র আক্রমণে তার প্রাসঙ্গিকতা ধরা পড়বে। 'ভারতাত্মা কালিদাস' গ্রন্থটি তার পরিচয় বহন করছে। অনুরূপ গ্রন্থ 'রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি' (১৩৬৯) এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙালির ইতিহাস নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্র একদা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং নিজেই সেই ক্ষোভ দূর করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন। বাঙলার ইতিহাস রচনার কালানুক্রমিক ধারা ও রচনাপদ্ধতির ইতিহাস অর্থাৎ 'হিস্ট্রিও-গ্রাফি' প্রবোধচন্দ্রই প্রথম উপস্থাপিত করলেন তাঁর 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' গ্রন্থটিতে (১৯৫২)। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একখানি 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করতে বলেছিলেন সহজ ভাষায়, যাতে সকলেই পড়ে বুঝতে পারে। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সে কর্তব্য পালন করতে পারেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে সে বেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ও ভাগবত ধর্ম' (বিচিত্রা, ১৩৩৪), 'অশোকের ধর্মনীতি' (বিশ্বভারতী ১৩৫০), 'গীতাবিচার' (শারদীয়া দেশ ১৩৫৮), 'ধর্মরাজ অশোক ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির' (বিশ্বভারতী ১৩৬৪) প্রভৃতি। ইতিহাসচর্চা ছাড়া রবীন্দ্রচর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা বিচারে ও ব্যাখ্যায়, 'মালতী-পুঁথি'র গুরুত্ব নির্ণয়ে, রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ছন্দ' গ্রন্থ সম্পাদনায় তিনি গবেষণার যে উচ্চ মান স্থাপন করে গেছেন পরবর্তীয়দের জন্য, তার তুলনা নেই। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে তাঁর রচিত 'বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। তার চোদ্দ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (১৩৫৬), 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' (১৩৬৮), 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' (১৩৬৯) ও 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৮) - প্রত্যেকটি বই আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের চৌষট্টি বছর ব্যয় করেছেন ছন্দ-জিজ্ঞাসা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে 'ছান্দসিক' বলে ডাকতেন এই নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৮৬ অবধি তিনি বাঙলা ছন্দশাস্ত্রকে একক প্রচেষ্টায় গাণিতিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির 'পর দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদারের মতে, "বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।" প্রবোধচন্দ্র প্রথমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত নামগুলিই রেখেছিলেন, পরে 'অক্ষরবৃত্ত'কে বদল করেন 'যৌগিক' নামে। কিন্তু কয়েকবার নাম বদলের শেষে (ছন্দের প্রকৃতি-অনুযায়ী) তিনি শেষে এদের নামকরণ করেছেন 'মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত'। প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-চর্চা নিয়ে দীর্ঘ পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন, তার অবকাশ এখানে নেই। তিনি একাই বাঙলা ছন্দশাস্ত্রের সমগ্র ব্যাকরণ ও ইতিহাস রচনা করে গেছেন। তাঁর রচিত ছন্দ-বিষয়ক গ্রন্থের নামগুলিই এখানে শুধু দিলাম, তাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করা সম্ভব হল না—'ছন্দপরিক্রমা' (১৯৬৫), ছন্দপরিক্রমা নতুন সং (১৯৭৭), 'বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৪), 'ছন্দসোপান' (১৯৮০), 'আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য' (১৯৮০), 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮১), 'বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি' (১৯৮৩) এবং তাঁর শেষ মুদ্রিত গ্রন্থ 'নূতন ছন্দপরিক্রমা' (১৯৮৬)। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, দলবৃত্ত—বাঙলা ছন্দের এই ত্রিধারাকে সহজভাবে বোঝাতে গিয়ে তিনি তাদের বলতেন, 'জয়দেবী' 'কৃত্তিবাসী' 'রামপ্রসাদী'। আমার ছাত্রজীবনে সত্যিই চমকে উঠেছিলাম যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পাপছাড়া'র "নাম তার সন্তোষ। জঠরে অগ্নিদোষ। হাওয়া খেতে গেল সে পচঘাঁ'র সঙ্গে জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন' শ্লোকের, বিদ্যাপতির 'আজু রজনী হম' পদের এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগনমন' সংগীতের ধ্বনিগত ও অবয়বগত মিল দেখিয়েছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র নিরহংকার, দুঃখজয়ী, স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। জীবনে কর্মযোগী ছিলেন। দুধ, ফল, মধু তাঁর প্রিয় ছিল। ফুল ভালোবাসতেন। তাঁর শেষ ইচ্ছায় ব্যক্ত করেন যে তাঁর মৃত্যুর পর 'স্মরণসভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের যেন ফুল, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়—যেন তাঁদের জীবন ফুলের মতো সুন্দর, ফলের মতো ফলবান্ এবং মিষ্টান্নের মতো মধুর হয়। এই মহৎ উদারপ্রাণ পিতৃতুল্য শিক্ষকের স্নেহচ্ছায়ায় ও শাসনে বর্ধিত হয়েছিলাম—আমার জীবনে এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আর কিছু নেই। অ-সাধারণ মানুষ ছিলেন বলেই তিনি শেষ কথা লিখে গেলেন—

> আমি যথেষ্ট দীর্ঘায়ু হয়ে পরম শান্তিতে ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে গিয়েছি। আমার মৃত্যুতে শোকের কোন কারণ নেই, বরং আনন্দেরই কারণ আছে।

শংকরপ্রসাদ মিত্র

শহীদুল ইসলাম

কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙলা তথা ভারতের সুসন্তান অকুতদার ডঃ শঙ্করপ্রসাদ মিত্র গত ৯ অগস্ট অসংখ্য মানুষের ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে চলে গেলেন।

শংকরপ্রসাদের জন্ম ১৯১৭-র ডিসেম্বরে এই কলকাতাতেই। দেশের লড়াকু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তখন খুঁজে চলেছেন ইংরেজ অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির পথ। পথের নিশানায় যুবমানসের চিত্তে তখন টগবগে নেশা। সে কি কখনো শুধুই অ্যানাটমির মানুষ হতে পারে, মনের মধ্যে যার প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার উদ্দীপনা! এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি শংকরপ্রসাদ। সারা জীবন ধরে হেঁটে গেলেন বন্ধুর পথে। পিছনের মানুষ এগিয়ে আসুক বাধাহীন সুন্দর এক পথ বেয়ে—এই সংকল্পে একটার পর একটা রাস্তা তৈরিই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শংকরপ্রসাদ মানুষকে ভালোবাসার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানজড়িত কর্মযোগের মধ্যে।

শিক্ষার সমস্ত স্তরেই প্রশংসনীয় সাফল্যের অধিকারী শংকরপ্রসাদ মিত্র ১৯৪১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ গ্রাজুয়েশন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান বিদেশে। ট্রিনিটি কলেজ থেকে লাভ করেন ট্রাইপস (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বিতরণী পরীক্ষা) সহ গ্রাজুয়েশন। ১৯৪৩-এ পাশ করেন ব্যারিসটারি। ৪৪-এ কলকাতায় ফিরে যোগ দেন বঙ্গবাসী এবং ইউনিভারসিটি ল কলেজে অধ্যাপনার কাজে।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে

ভারতের মানুষের আমৃত্যু প্রতিবাদ তুঙ্গে। চলছে মাতৃভূমিতে তে-রঙ্গা পতাকা পুঁতে দেবার বাঁবভাঙা আন্দোলন। আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে সুদূর গ্রেট বিটেনে শংকরপ্রসাদের মনেও। দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৪১ সালে ছাত্রাবস্থায় 'কেম্‌ব্রিজ মজলিস' এবং 'ফেডারেশন অব ইনডিয়ান স্টুডেনট্‌স্‌ সোসাইটি'র যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় তাঁর কাঁধে। সে বছরেই কেমব্রিজে ভারতের ছাত্রপ্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন ইনটারন্যাশানাল স্টুডেনট্‌স্‌ কংগ্রেসে। ১৯৪২-এ গ্রেট ব্রিটেনে গঠিত হয় কমিটি অব দি ইনডিয়ান কংগ্রেসমেন যার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শংকরপ্রসাদ।

১৯৪৪ সালে দেশে ফিরে যোগ দেন কলকাতা কংগ্রেস কমিটিতে। বাংলাদেশের সর্বত্র তখন বিভেদকামী শক্তির লেলিহান অগ্নিশিখায় শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সংহতি পুড়ে ছারখার। সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদে সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যান শংকরপ্রসাদ অশান্ত এলাকায়। মূল্য পেয়েছিলেন বইকি! মির্জাপুর স্ট্রীটে পুড়িয়ে ফেলা হয় তাঁর গাড়ি।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যুবক শংকরপ্রসাদ শিয়ালদহ কেন্দ্র থেকে জিতে বিধানসভায় যোগ দেন ১৯৫২ সালে। সন্তোষকুমার বসুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের দায়িত্ব পান ১৯৫৬ সালে। একই সঙ্গে পরিচালনা করেন বিচার ও আইন বিভাগের কাজকর্ম।

ওকালতি জীবন শুরু কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৪৪ সালে। আইনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর মাথায় তুলে দিয়েছিল সাফল্যের শিরোপা। ১৯৫৭ সালে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বহাল হন হাইকোর্টের বিচারক পদে।

১৯৭২ সালের ৩১শে জুলাই উন্নীত হন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে। রাজ্যের বিচার-বিষয়ক শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে তাঁর সাত বছরের প্রধান বিচারপতিত্বের কালে। প্রধান বিচারপতি হিসাবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ পোর্টব্লেয়ার এবং মায়াবন্দরে খড়পাতা ছাউনির পরিবর্তে ১৯৭২-৭৩-এ নতুন কোর্ট বিল্ডিং তৈরি। পুরানো কোর্ট রেকর্ড সংরক্ষণে চালু করেন আধুনিক পদ্ধতি মাইক্রো-ফিল্‌মিং-এর ব্যবস্থা।

মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিপত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে কুড়িয়েছেন বহু প্রশংসা। সেখানে প্রদর্শিত হয় রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বেশ কিছু মনীষীর হাতের লেখা নথিপত্র।

ভয়-ভীতি শংকরপ্রসাদ মিত্রকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। ১৯৭০-৭১ সালে নকশাল আন্দোলনের স্বর্ণযুগে যখন একের পর এক মাথা খসে পড়ছিল মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি থেকে, সোচ্চার প্রতিবাদ ফুটে উঠেছিল তাঁর নির্ভীক কণ্ঠে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে বারো ঘণ্টার মারাথন জনসভা করেন ৭০ এবং ৭১ সালে। গোল পার্কে স্বামী বিবেকানন্দর আবক্ষ মূর্তিতে কলঙ্কলেপনের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতায় হরিজনদের মিছিলে নেতৃত্ব ছাড়াও যোগ দেন মূর্তির পাদদেশে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব-সমিতির চব্বিশ ঘণ্টার অনশন অবস্থানে। সমাজ-সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধায় শুধু নয়, তাঁদের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

গঠনমূলক ভাবধারার এই মানুষটি ছিলেন বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। যখন বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির সভাপতি ছিলেন, ১৯৬৬-তে একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান-নিকোবর এবং দিল্লীতে আয়োজন করেন ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ উৎসব। বিবেকানন্দর আদর্শেই শুধু নয়, গান্ধী মতাদর্শেও সমান অনুরাগী শংকরপ্রসাদ ১৯৬৮-তে গান্ধীজন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধক রামকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তিই তাঁকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল সব ধর্মের মানুষকে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। উৎসাহিত করেছেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে। 'হরিজন নব যুবক লীগ'-এ সভাপতিত্ব প্রমাণ করে, ধর্মনিরপেক্ষ এই মানুষটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত বড় বন্ধু।

১৯৭৪-এ প্রধান বিচারপতি থাকার সময় এ. এল. ডায়াস চার সপ্তাহের ছুটিতে গেলে রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শংকরপ্রসাদ মিত্র। ওই সময় পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় ব্যাপক খরা। সরকারি ফাইলপত্রের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। তখন খরাপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর সেবাব্রতী মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কলকাতার তৎকালীন শেরিফ এবং পারিবারিক বন্ধু রাজভবনের তৎকালীন স্পেশাল অফিসার এস. এম. বোসের সহযোগিতায় মাত্র কুড়ি দিনে এগারো লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেন। সমস্ত অর্থ তুলে দেন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটির মতো সংস্থার হাতে।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর প্রবল উৎসাহ। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সভাপতি থাকার সময় অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রখ্যাত শিল্পীদের মূল চিত্রাঙ্কনের প্রদর্শনীর জন্য তৈরি করেন আর্ট গ্যালারি।

দরিদ্র, হতাশ মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন অতি পরিচিত 'ক্যালকাটা চ্যারিটেবল সোসাইটি'। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'দি সিটি হেলথ অ্যানড ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন'। কলকাতার চেতলায় বয়স্ক আবাস 'নব নীড় নব আশা'-র চেয়ারম্যান ছিলেন দীর্ঘকাল। ঠাকুরপুকুরে প্রায় পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত ভারতের অন্যতম বৃহৎ 'ক্যান্সার সেণ্টার অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার হোম' প্রতিষ্ঠা করে চ্যারিটেবল সোসাইটি যার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র।

সারা জীবন ধরে মানুষকে ভালোবাসার প্রতিদানে জনপ্রতিনিধিরা দলমতনির্বিশেষে নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠান। কর্মের মধ্যেই কর্মময় জীবনের অবসান—এর চেয়ে মহামূল্য প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!